পদচিহ্নের পদাবলী

অর্চনা চৌধুরী

পরিবেশক

পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক : সুনীল দাস
৭৭, এস. কে. দেব রোড
কলিকাতা-৭০০০৪৮

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৭১

প্রচ্ছদ : শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর :
শীতল চক্রবর্ত্তী
শ্রীনারায়ণ প্রিণ্ট
৩।১ বি, মোহনবাগান লেন
কলিকাতা-৭০০০০৪

উৎসর্গ

বাবা

ও

মাকে

"গৌরী—"

চমকে উঠলেন সুপর্ণা মুখার্জী। এদিক ওদিক চাইলেন সন্ধানী দৃষ্টিতে। কেও কোথাও নেই। সুপর্ণার কল্পনা যেন উৎকর্ণ হয়ে তার জীবনের সবচেয়ে সুখকর এক আকাঙ্ক্ষার ভাষার প্রতিধ্বনি শুনতে পেল।

—"আজ এতদিন পরে এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে কেন গৌরী"—

"খুঁজছি"—

"কাকে ?"

"যার প্রতীক্ষায় আমার প্রতিটি অণু পরমাণ্ উন্মুখ হয়ে আছে"—

"কিন্তু সে তো আর কোনদিন তোমার কাছে ফিবে আসবে না সুপর্ণা। তোমাব মনের নিভৃতে তোমায় যে একাই থাকতে হবে চিরকাল।

দপ্ দপ ক'রে পাদ প্রদীপের আলো জ্বলে উঠল। সুপর্ণা দেখছে। দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে। কার ওই কণ্ঠস্বর! কে ডাকল তার নাম ধ'রে! অতীতের কণ্ঠস্বর কি মনে থাকে চিরকাল? থাকে না। থাকে শুধু একটুকরো স্মৃতি। মর্মান্তিক সত্য আর দুঃসহ দহন জ্বালা। তবু এই তো জীবন! তার জীবন প্রবাহে একদিন যে সূর্য, চন্দ্র, তারকা ছায়া ফেলেছিল, এখন তারা শুধু বয়ে চলা জীবন তরঙ্গের চলচল্-ছলছল জলের কান্না। কি আদি অনন্ত পুরোনো এই কথাটা, অথচ কি নিষ্ঠুর চিরন্তন। বেদনার রক্তাক্ত চেতনা।

সুপর্ণা দেখছে তুমি-আমি-সে ও সব মানুষকে। দেখছে গিরি-কন্দরের সাথে জ্যোৎস্নার আলোর মিতালীকে, আলেয়ার সঙ্গে

অন্ধকারের। দেখছে ঝড়ের কান্নার গিরিশিখরে বিদীর্ণ হয়ে মহাশঙ্খ-রবে রূপান্তরিত হওয়া।

দিনগুলো ভেসে চলেছে পাল তোলা নৌকার মত। এ নৌকো কোন ঘাটে বাঁধবে না। কেবল মাত্র ঢেউয়ের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে কোলাকুলি ক'রতে ক'রতে ভেসে যাবে।

বড় ক'রে একটা নিশ্বাস ফেলল সুপর্ণা। আজ বাড়ীটা কি নিস্তব্ধ। যেন বাজে পোড়া একটা ছড়ান ছিটানো বিরাট বটগাছ। অথচ অনেক শব্দ হয়েছে এ বাড়ীতে। বিয়ের সানাই, অন্নপ্রাশন, পৈতে, জন্মদিনের কত কলরব, কত আসা-যাওয়া, কত গান, কত ঘুঙুরের ঝনক্-ঝন্ শব্দ। সন্ধ্যায় জলের ছিটে দিয়ে মা' সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে শাঁক বাজিয়েছেন, ধূনো দিয়েছেন ঘরে ঘরে। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজো, পাঁচালী-পাঠ সেরে উলু দিয়েছেন শাঁক বাজিয়েছেন, সকলকে ডেকে ডেকে প্রসাদ দিয়েছেন হাতে। আজ সব চুপ। খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। উঠোনের আনাচে কানাচে আগাছায় ভ'রে গেছে। ওই সেই কাঠ মল্লিকা গাছটা। সাদার ওপর পাটকেলী রঙের ডোরা কাটা থোকা ফুলে গাছটা আজও ভ'রে আছে। তলায় আগাছাব ওপর ঝরে পড়েছে অনেক ফুল। স্থলপদ্ম গাছটা নেই, বোধ হয় শুকিয়ে মরে হেজে গ্যাছে। কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারে না। যাদের যাবার কোন কথা নয়, তারাও চলে যায়। বাবা মা শঙ্কর ভাস্কর এদের তো আজও বেঁচে থাকবার কোন বাধা ছিল না, তবু তারা আজ কেউ নেই। এই যে এতবড় বাড়ীখানা বাবা করেছিলেন, কত হিসেব ক'রে। যাতে কারো সঙ্গে কারো ঠুকোমুকি না লাগে। সকলেই নিজের স্বাচ্ছন্দ নিয়ে পাশাপাশি বাস ক'রতে পারে। কোন হিসেবই তার কাজে লাগল না। আজ এতবড় বাড়ীখানা যেন প্রেতপুরীর মত একটা ছমছমে শিহরণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আসলে এ গল্পটা আজকের নয়। অনেক অনেক বছর আগের ঘটনা এটা। তখন দেশও স্বাধীন হয়নি, পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানেরও জন্ম হয় নি। যাদের রাজত্বে কখনও সূর্য্য অস্ত যায় না সেই ব্রিটিশ রাজের রাজত্ব চলছে তখন। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের চূড়ায় চূড়ায় তখন খাঁটি গোরা সাহেবদের দুর্দান্ত প্রতাপ। সাত ফুট লম্বা, টুকটুকে চেহারা সব। তক্‌মা আঁটা খাঁকী পোষাক পরে বুট পায়ে গট্‌গট্‌ করে হেঁটে চলে বেড়ায়। দেখলে ভয়ও করে, ভক্তিও হয়। সাহেব তো নয় যেন এক একটা বাঘের বাচ্ছা। বাবুদের এতটুকু খুঁত পেলে আর রক্ষে থাকে না। রেগে মেগে কি সব ইংরেজী বলে তার একবর্ণও বুঝতে পারে না বাবুরা। তবু তারা সায়েবদের পেছনে ঘুরঘুর করে আর কথায় কথায় "ইয়েস্ স্যার—ভেরি গুড স্যার"—বলে। ওর বেশী বলেও না, বলতে সাহসও পায় না। কিন্তু সব বাবুরাই কি সমান! সায়েবদের সঙ্গে সমানে কথা বলতে পারে এমন বাবুও আছে। বরেন মুখুজ্জের কথা বলছি। বয়েস বোধ হয় তখন তার পঁচিশ ছাব্বিশ। যেমন রাজপুত্তুরের মতন দেখতে তেমনি সুন্দর স্বাস্থ্য। সায়েবদের কথা শুনতে শুনতে অনর্গল ইংরেজী বলতে শিখেছেন। অফিসের বড় দারোগা রবীন হালদার বলেন—"তোমার শীগগীরই উন্নতি হবে হে ছোক্‌রা। ব্রিটিশ রাজত্বে যেভাবে ইংরেজী বুলি আওড়াতে শিখেছ, কোনদিন না আমায় সরিয়ে তোমাকেই এখানে বসিয়ে দেয়।"

—"কি যে ঠাট্টা করেন স্যার! আপনার জোরেই তো আমি চলি ফিরি। আপনি ছেলের মতন ভালবাসেন তাই না এত ভরসা আমার।"

এ দুনিয়ায় বিনয়ে কে না গলে! রবীন হালদারও গলে যান। তার মনের গুমোটের ওপর যেন এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ছড়িয়ে

পড়ে। হাসিমুখে বলেন—"ঠাট্টা নয় হে বরেন। সেদিন রবার্ট সাহেব আমায় তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন—কত মাইনে পাও, কোথায় থাক, বিয়ে করেছ কিনা? আমার উত্তর শুনে সাহেব তো মহাখাপ্পা। চোখ পাকিয়ে বললেন—"নো-নো, এই সামান্য পে-তে কোন ইয়ংম্যানের চলতে পারে না। হি ডিজারভস্ প্রমোশোন।"

তা কতই বা মাইনে পেতেন তখন বরেন মুখুজ্যে। মাস গেলে মাত্র আট টাকা। ঐ টাকাতেই তখন তাকে সংসার চালাতে হত। ঐ টাকাতেই তার মাছ, ভাত, ঘি, দুধ, দই সবই জুটতো। এগারো বছরের সহধর্ম্মিনী দুর্গা একদিন তের বছরেরটি হয়ে স্বামীর ঘর করতে এল। বরেন মুখুজ্যের চাকরীর তখন সবে এক বছর কেটেছে। চৌকীদার থেকে দফাদার হয়ে তখন তার মাইনে হয়েছে আট টাকা। এক গলা ঘোমটা দিয়ে দুর্গা যেদিন তার খড়ের ছাউনী দেওয়া এক-ঘরের ছোট্ট সরকারী কোয়াটারে এল, সেদিন বরেনের মনে একটা অজানা শিহরণ জেগেছিল। সেই দিনই তিনি নিজেকে প্রথম পুরুষ বলে অনুভব করেছিলেন। তার মনে হয়েছিল ঐ যে ফুটফুটে মেয়েটি পাছা পাড় রাঙা সাড়ী পরে তার বাবার পাশে দাঁড়িয়ে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বারবার তার দিকে চেয়ে, চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিচ্ছে, ঐ মেয়েটি তারই বধূ। ওর সিঁথির ওই টকটকে সিঁন্দুর, কপালের টিপ, পায়ের আলতা এ সব তারই কল্যাণের জন্যে। সে সব দিনের কথা ভেবে পরেও রোমাঞ্চ অনুভব করেছেন বরেন মুখুজ্যে। দিন তো নয়—স্বপ্ন! মধুর স্বপ্ন।

এক শরতের পূর্ণিমা রাতে দুর্গার কোলে এল তার প্রথম সন্তান। বরেন মুখুজ্যের আনন্দ ধরে না। প্রথম বাবা হবার আনন্দ। নিজেকে যেন আরও দায়ীত্বশীল, আরও সংসারী বলে মনে হয়। মেয়ের বাপ সোজা কথা! দেখতে দেখতে মেয়ে বড় হবে, তার বিয়ে দিতে হবে, তার জন্যে চাই অনেক টাকা। আরও মন দিয়ে কাজ করেন বরেন মুখুজ্যে। অপিসের সবাই ধরে—"খাওয়াতে

হবে মুখুজ্জো বাবু।" বরেন মুখ টিপে হাসেন।

—"অমন মন ভোলানো হাসি হাসলেই চলবে না—বরেন। ও হাসি বৌ-এর জন্যে তুলে রাখ। আমাদের জন্যে পকেট থেকে কিছু ছাড়।"

—"ভারী তো মেয়ে! ছেলে তো আর নয়।"

—"ওহে বিপিন আমাদের বরেনের কথা শুনে যাও। বলে মেয়ে তার আবার খাওয়াবে কি? সে যুগ কি আর আছে ভায়া, যে মেয়েকে হতচ্ছেদ্দা করবে।"

অনেকগুলো টাকা সেদিন পকেট থেকে খসাতে হয়েছিল বরেন মুখুজ্জেকে। রর্বাট সাহেবও সেদিন সবার সঙ্গে বসে পেট ভরে লুচি পায়েস খেয়েছিলেন। তা তখনকার দিনে তো জিনিসপত্রের এমন দাম ছিল না! টাকায় বত্রিশটা বড় বড় রসগোল্লা, পানতুয়া, বাঘব-সাই। পয়সায় দুটো করে সিঙ্গাড়া কচুরী। তখনও দেশে চপ কাট্‌লেটের আমদানী হয়নি। খাবার ব্যাপারেও কোন কড়াকড়ি ছিল না। কে কত খাবি—খা। সেদিন পাল্লা দিয়ে সবাই রসগোল্লা পানতুয়া খেয়েছিল। রবার্ট সাহেবের তো চক্ষু ছানাবড়া- -"হরিব্‌ল আর খেও না হালদার মারা যাবে যে।"

—"নো এ্যাংকসাস্ সাহেব। কিচ্ছু হবে না আমার। আমি আরও থারটি রসগোল্লা খেতে পারি।"

—"আই এগ্রি বাট্ ডোণ্ট টেক্ মোর—"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাওয়া বন্ধ করেছিলেন রবীন হালদার।

মেয়ের মুখ দেখে সবাই একটা করে রূপোর টাকা দিয়েছিল। রর্বাট সাহেব দিয়েছিলেন একটা আস্ত গিনি। তখন সোনার ভরি ছিল কুড়ি টাকা। গিনিটা মেয়ের কচি হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়ে রর্বাট সাহেব হাসিমুখে বলেছিলেন—"মুকার্জি তোমার বেবি ভেরি বিউটিফুল হোবে। আই কন্‌গ্র্যাচুলেট ইউ—"।

সেদিন কী আনন্দেই যে কেটেছিল সারাটা দিন। দুর্গা তখনও

সম্পূর্ণ সুস্থ নয় কিন্তু হালদার গিন্নিই সেদিন সব ভার নিয়ে দায় উদ্ধার করে দিয়েছিলেন। যাবার সময় দুর্গাকে বললেন—"এবারে বরেনকে বল তার মাকে নিয়ে আসুক। কচি মেয়ে নিয়ে তুমি সংসারের সব কাজ করবে কি করে?"

ছোট্ট ফুটফুটে মোমের পুতুলের মত মেয়েকে কোলে নিয়ে ছড়া কাটে দুর্গা—

—"আজ খুকুর অধিবাস, কাল খুকুর বিয়ে
খুকু যাবেন শ্বশুরবাড়ী ড্যাং নগর দিয়ে।
মা কাঁদেন, মা কাঁদেন ধূলায় লুটায়ে
সেই যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে।
বাপ কাঁদেন, বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে
সেই যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্দুক সাজায়ে।
মাসী কাঁদেন মাসী কাঁদেন হেঁসেলে বসিয়ে
সেই যে মাসী ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে।
পিসি কাঁদেন, পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে
সেই যে পিসি দুধ দিয়েছেন বাটি সাজিয়ে।"

বরেন মুখুজ্যে কখন নিঃশব্দে এসে পেছনে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন জানতেও পারেনি দুর্গা। দুর্গা থামতেই বলেন—"ব্যাস্ এখানেই শেষ। আর কেউ কাঁদবে না খুকুর জন্যে।"

মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে ঘুরে বসেন দুর্গা।

—"ওমা তুমি কখন এলে, জানতেও পারিনি তো!"

—"মেয়ে নিয়েই দিনরাত বিভোর হয়ে বসে আছ। আমার মত অভাজনের দিকে চাইবার কি আর তোমার সময় আছে?"

—"এই শুরু হ'ল! তা হ্যাঁ গো—মেয়ে কি আমার একার! তোমার নয়? একটু ধর তো খুকুকে আমি তোমার জলখাবারটা নিয়ে আসি।" বরেন মুখুজ্যের কোলে মেয়েকে দিয়ে রান্নাঘরে চলে যান দুর্গা।

মেয়েকে কোলে নিয়ে তক্তপোষের ওপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসেন বরেন মুখুজ্যে। রান্না ঘরের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে হাঁটু দুলিয়ে মেয়েকে দোল দেন আর ছড়া কাটেন—

দোল দোল দোল দোলানী।
কানে দেব চৌদানী॥
কোমরে দেব ভেড়ার টোপ।
ফেটে মরবে পাড়ার লোক॥
মেয়ে নয়কো সাত বেটা।
গড়িয়ে দেব কোমর পাটা॥
দ্যাখ শত্তুর চেয়ে—
আমার কত সাধের মেয়ে॥

খাবারের থালা হাতে হাসিমুখে দুর্গা ঘরে ঢোকেন।

—"বাবাঃ এতও আসে তোমার"—মেঝেতে জলের ছিটে দিয়ে কাঁঠাল কাঠের বড় পিড়ি পেতে খাবারের থালা রাখেন। ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে ঢাকা দেওয়া ঠাণ্ডা জল পাশে রাখেন।

—"দাও ওকে আমার কাছে। বারান্দায় জল, গামছা রেখেছি হাত মুখ ধুয়ে এসে খেতে বস।"

বরেন মুখুজ্যে খেতে বসলে মেয়ে কোলে সামনে এসে বসেন দুর্গা। সলজ্জভাবে বলেন—"হ্যাঁ গো খুকুর নাম রাখলে না তো?"

—"যা ফুটফুটে মেয়ে তোমার গৌরী বলে ডাকলেই হবে, কি বল?"

—"বেশ নাম, তাই না?"

বরেন মুখুজ্যে হাসেন।

—"আমি যা বলব তাই তোমার বেশ। তোমার নিজের কোনও মতামত নেই?"

—"কি যে বল তার ঠিক নেই। তুমি আমি কি আলাদা?"

গৌরী তখন টলে টলে হেঁটে বেড়ায়। দূরে বসে দুহাত বাড়িয়ে

দুর্গা ডাকেন—হাঁটি-হাঁটি পা-পা। গৌরীর আনন্দ ধরে না। ছোট ছোট তুলতুলে নরম হাতে তালি দেয়—তা-তা-তা।

—"তা-তা নয় পা-পা, হাঁটি হাঁটি পা পা—"

গৌরী যখন দুবছরের তখন দুর্গার কোল জুড়ে এল খোকন সোনা। যেমন রং তেমনি চোখ মুখ। যে দেখে সেই বলে—'আহা ছেলে তো নয় যেন আকাশ থেকে পূর্ণিমার চাঁদ নেমে এসেছে।"

দুর্গা ছেলের কপালের এক কোণে কাজলের টিপ এঁকে দেন—চোখ লাগবে। কাজললতা গরম করে, গরম গরম কাজল পরিয়ে দেন ছেলের চোখে। খয়েরের টিপ পরান কপালে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় নিজেই চমকে ওঠেন দুর্গা—যদি চোখ লাগে। ছেলের হাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুল দাঁতে ছুঁয়ে থুথকুড়ি দিয়ে বলে ওঠেন—"ষাট্ ষাট্—"।

জ্যোৎস্না রাতে বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেকে চাঁদ দেখান দুর্গা—

'আয় আয় চাঁদামামা টি দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা
মাছ কুটলে মুড়ো দেব
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব
কালো গরুর দুধ দেব
দুধ খাবার বাটি দেব
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।'

ছেলে হাঁটতে শিখলো। গৌরীর কাছে ছেলেকে রেখে দুর্গা রান্না করেন।—'গৌরী ভাইকে দেখো—'। গৌরীর তখন দিদি দিদি ভাব। ভায়ের হাত ধরে বলে—"ভাই লে আয় খেলি—"। ভাই তখন আলগোছ হয়ে বসে একটা পিঁপড়ের গর্তে আঙ্গুল ঢোকাবার চেষ্টা করছে।

—"এ মা! কি বোকালে তুই। পিঁপলে কামলাবে না? আয়

খেলি—" গৌরীর তখনও জিবের আড় ভাঙ্গেনি। দুজনে মুখোমুখি বসে আগডুম বাগডুম খেলে। কচি কচি গলায় নিজের আর ভায়ের হাঁটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছড়া কাটে গৌরী—

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ডুলি,
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি
কমলাপুলির টিয়ে টা
সূর্যি মামার বিয়ে টা।
আয় রঙ্গ হাটে যাই
গুয়ো পান কিনে খাই।
একটা পানে ফোঁপড়া
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।
কচি কচি কুমড়োর ঝোল,
ওরে খোকা গা তোল।

দুর্গা ছেলের নাম রাখেন শংকর। ধীরে ধীরে দুটি ভাই বোন বড় হয়—যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল।

কাজীপুরের সতীশ পণ্ডিতের পাঠশালায়—ছেলে মেয়েকে ভর্ত্তি করে দেন বরেন মুখুজ্যে। ছোট্ট গ্রাম—ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বেশি নয়। দারোগার ছেলে মেয়ে বলে ওদের সম্মান আলাদা। ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে দুই ভাই বোনে পাঠশালায় যায়। হাতে খাগের কলম আর বগলে কচি কলাপাতা জড়িয়ে সূতো দিয়ে বাঁধা। গৌরীর পরনে লাল ডুরে শাড়ী, আলতা পরা পায়ে রূপোর মল। হাতে সোনার বালা, গলায় মটর মালা। গৌরী পাঠশালায় চলেছে ওর পায়ের মল বাজছে—ঝমর ঝম, ঝমর ঝম। থোপা থোপা চুলগুলো বাতাসে উড়ে উড়ে ওর চোখে মুখে এসে পড়ছে। শংকরের কথার বিরাম নেই।—"গৌলী-লে দ্যাখ-দ্যাখ—নীলকনথ পাখী—"

—এঃ মা ওটা বুঝি নীলকণ্ঠ পাখী! ও তো মাছরাঙ্গা—! তুই কিচ্ছু চিনিস নে—"

শংকরের মাথার চুলগুলো চূড়ো করে বাঁধা। গায়ে একটা লেস্ দেওয়া সবুজ সাটিনের লম্বা ঝুলের জামা। ভায়ের একখানা হাত গৌরীর হাতের মুঠোয় ধরা।

"গৌলী-লে দ্যাখ দ্যাখ পেজাপতি—আমি ধলবো—" গৌরীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কোমর সমান সবুজ ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে প্রজাপতির পেছনে পেছনে ছুটে চলে শংকব। কত রকম প্রজাপতি! ধান গাছের মাথায় গিয়ে বসছে আবার তখুনি উড়ে যাচ্ছে।

"এই শংকর থাম, দাঁড়া। ধানক্ষেতের মধ্যে সাপ আছে"—সবুজ ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে দুটি ভাই বোন ছুটে চলেছে। একজন প্রজাপতির পেছনে আর একজন ভাইয়ের পেছনে। যেখানে ধানগাছ একটু বড় সেখানে দুজনেই ক্ষেতের মধ্যে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে? শুধু শোনা যাচ্ছে গৌরীর গলা—"শংকর লক্ষ্মী ভাইটি আমার, থাম। আমি প্রজাপতি ধরে দেব।" আবার কখনো ভাইকে ধমক দিচ্ছে শংকর ভাল হবে না বলছি। বাবাকে বলে দিয়ে মার খাওয়াবো।" গৌরী ছুটছে আর ওর পায়েব মল বাজছে—ঝুম-ঝুম-ঝুম।

ছুটতে ছুটতে ওরা প্রায় ধান ক্ষেত পার হয়ে এসেছে। হঠাৎ একতারার টুং টাং আওয়াজ কানে আসতেই গৌরী প্রাণপণে চীৎকার করে ওঠে—"বোষ্টুমী মাসী—"

—"কে রে—রাধারানী? কি হয়েছে?" ওধার থেকে একতারা হাতে ব্রজ বোষ্টুমী ছুটে আসে।

—"শংকরকে ধর বোষ্টুমী মাসী ও আমার কথা শুনছে না। ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে প্রজাপতি ধরতে ছুটছে।"

ব্রজ বোষ্টুমী ততক্ষণে শংকরকে কোলে তুলে নিয়েছে। গৌরী ছুটে এসে ব্রজ বোষ্টুমীর আলখাল্লার একটা প্রান্ত ধরে হাঁফাতে থাকে।

—"একা একা পাঠশালায় যাচ্ছ রাধারানী, রামধারীলাল কোথায় ?"

—"ওর তো বুখার হয়েছে—"

—তাই বলে একা একা আসবে তোমরা ? বাড়ী ফিরে গেলেই হত। বাবা মা জানেন তোমরা একলা বেরিয়েছ ?"

—"ধারে রাস্তা তো চিনি আমরা। ভেবেছিলাম তোমার বাড়ী যাব। সেখান থেকে তোমার সঙ্গে পাঠশালায় যাব। তুমি যেন আবার মাকে বলো না মাসী। মা তাহলে আমায় কেটে ফেলবে।"

ব্রজ বোষ্টমী মৃদু হাসে, একতারায় টুং টাং আওয়াজ তোলে। —চল্ তোদের বাড়ী রেখে আসি। আমি এখন ভিন্ গাঁয়ে ভিক্ষেয় বেরোব।"

—নাচত মোহন নন্দ দুলাল
বঙ্কিম চরণে মঞ্জির ঘন বাজত
কিংকিনী তাঁহি রসাল।
স্থল পঙ্কজ দল জিনিয়া চরণতল
অরুন কিরণ কিয়ে আভা।
তাহার উপর মুখচান্দ সুশোভিত
হেরইতে ভাগ মন লোভা।
মণি আভরণ কত অঙ্গহি ঝলকত
নাসায় মুকুতা কিবা দোলে
মা মা মা বলি চান্দ বদন তুলি
নবীন কোকিল যেন বোলে।'

ব্রজ বোষ্টমী একতারা বাজিয়ে গুন গুন করে গান গাইছে। ওর একপাশে গৌরী আর একপাশে শংকর ওর আলখাল্লার প্রান্ত ধরে ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে বাড়ীর পথ ধরেছে। গৌরীর পায়ের মল, বাজছে ঝুমুর ঝুম—ঝুমুর ঝুম।

দুই

বরেন মুখুজ্যে তখন চাকরীর আরও উন্নতি হয়ে পাবনা বদলি হয়েছেন। তিনি তখন পাবনা জেলার লাইন দারোগা। যত ক্ষমতা তত সম্মান তার। সে কি আজকের কথা? তারপর সেই সেইবার? পদ্মায় কি ভাঙ্গন তখন। দেখতে দেখতে গোটা পাবনা সহরটাই বুঝি রাক্ষসী পদ্মা গিলে ফেলবে! তা রাক্ষসী বৈকি? কম লোকের সর্বনাশ করেছে ও। রাতারাতি কত বাড়ী, কত মানুষ, কত গরু ঘোড়া ক্ষেত খামার পদ্মার বুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

সেই সময় উপেন পাকড়াশী তার সেই মস্ত বড় বাড়ীটা বাঁচাবার জন্যে অষ্টভুজার পূজো করেছিলেন। পদ্মা তখন দুরন্ত মেয়ের মত তার কোল ঘেঁসে কলকল ছলছল করে বয়ে চলেছে। পদ্মার সে কী রূপ? দেখলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। দুর্গাপূজোর মত চারদিন ধরে পূজো হল বলি হল। উপেন পাকড়াশী নিজে তার দু ঘোড়ার ফিটন্ গাড়ী হাঁকিয়ে এসে বরেন মুখুজ্যেকে নেমন্তন্ন করে গেলেন।—"সবাইকে নিয়ে যাবেন মুখুজ্যে মশাই। দেখি শেষ চেষ্টা করে যদি মায়ের দয়া হয়।"

কি ধূমের পূজোই করেছিলেন উপেন পাকড়াশী! এ তো তার একার দায় নয়—এ দায় যে সকলেরই। পদ্মার আক্রোশ থেকে সবাই বাঁচতে চায় তখন। মায়ের প্রণামী বলে, মানতের পূজো বলে মুঠো মুঠো সাহায্য এল। হাজার হাজার বলির পাঁঠার বোট্‌কা গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। মোষ বলি হল, উট বলি হল, গোসাপ বলি হল। সে এক হৈ হৈ ব্যাপার। দশদিন আগে থেকে উট আর গোসাপের গলায় সের সের মাখন মালিশ করতে করতে ঘেমে নেয়ে উঠলেন কর্ম কর্ত্তারা, পাছে বলি আটকে সর্বনাশ হয়ে যায়। একটা পূজোর মত পূজো হয়েছিল সেবার। গোটা জেলায় পাঁচ ছদিন ধরে

কেউ উনুন ধরায় নি, বাড়ীতে রান্না করেনি। ওখানে গেছে আর প্রসাদ পেয়েছে।

তা তখনকার দিনে আজকের মত তো হাহাকার ছিল না! তখন লোকে ভেজাল দিতেও শেখেনি, কালো টাকা, কালোবাজার করতেও শেখেনি। তখন ভিক্ষের চালেও মানুষকে পেট ভরাতে হত না। তখন লোকের মনে ধর্ম ভয় ছিল, পাপ করবার আগে পরিণতির কথা ভাবত, ঠাকুর দেবতার নাম করে তখন লোকে ব্যবসাও করত না! তখনকার দিনে পূজো মণ্ডপে লাউডস্পিকার লাগিয়ে সিনেমার গানও হত না,—বিসর্জনের সময় টুইষ্ট ড্যান্সও করত না কেউ। তখনকার মানুষের মনে বিশ্বাস ছিল ঠাকুর দেবতার ওপর আস্থা ছিল। ভয়ে ভক্তিতে পূজোর শুরু এবং শেষ হত। ঢাক বাজত, কাঁশি বাজত, জগঝম্প বাজত, কাড়া নাকাড়া বাজত। ঢাকে ঢাকে লড়াই হোত। দু-হাতে ধুনুচি নিয়ে ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে আরতি নৃত্য হত। ঢাকের বোল শুনে লোক বলে দিতে পারত কখন কি পূজো হচ্ছে—কখন পূজোয় বসেছে, কখন বলি হচ্ছে—কখন আরতি হচ্ছে। অষ্টভূজার পূজোতে জেলার সব ঢাকি বিনা পয়সাতে এসে ঢাক বাজিয়েছিল। নিজের তাগিদেই সবাই এসে পূজা মণ্ডপে ভীড় করেছিল। তাই বরেন মুখুজ্যে যখন বললেন—"কি দরকার ওই ভীড়ে গিয়ে?" তার কথার প্রতিবাদ করে দুর্গা বললেন—"তা থাকলুমই বা চারটে দিন ওখানে। পাকড়াশী গিন্নি নিজে এসে অমন করে বলে গেলেন। আমাদের থাকবার জন্যে দু দুটো ঘর ওদের ছেড়ে দেবেন, দু দুটো ঝী চাকর দেবেন। নিজের বাড়ীর মত থাকব, তোমার এত আপত্তি কেন বাপু? ছেলেমেয়ে দুটো কদিন পূজো দেখবে। আনন্দ করবে।" শেষ পর্য্যন্ত দুর্গা গিয়েছিলেন গৌরী আর শংকরকে নিয়ে। দুটি ভাই বোনে হাত ধরাধরি করে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। ঢাকিদের আসরের পাশে গিয়ে ভয়ে ভয়ে দাঁড়ায়। শংকরের ছোট্ট হাত গৌরীর ছোট্ট হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা। টানাটানা বড় বড়

চোখ মেলে গৌরী ভাইকে আরও কাছে টেনে নিয়ে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখে। ঝাঁকড়া চুল, কাল আবলুষ গায়ের রং, দৈত্যের মত চেহারা। ঢাকী সর্দার অনাথ মণ্ডলের। ও যখন নেচে কুঁদে পালকের শুঁড় লাগানো বিরাট ঢাক কাঁধে ঝুলিয়ে বোল দিতে শুরু করে তখন সকলে ভয়ে বিস্ময়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে। যেন মা দুর্গার পায়ের তলা থেকে স্বয়ং অসুরই এসে ঢাক বাজাতে শুরু করেছে। ভাং খাওয়ার নেশায় তখন বসে বসে ঝিমোচ্ছিল অনাথ মণ্ডল। শংকর আর গৌরী দুরত্ব বাঁচিয়ে ঝুকে পড়ে বড় বড় চোখ মেলে ওকে দেখছিল। হঠাৎ শংকর উত্তেজিত গলায় বলে উঠল—"গৌলী লে, এ যে অসুল—তল পালাই।" গৌরী তৎক্ষণে তার ছোট্ট হাত দিয়ে ভায়ের মুখ চেপে ধরেছে—"চুপ চুপ শুনতে পাবে।" অনাথ মণ্ডল তার লাল লাল ঢুলু ঢুলু চোখ মেলে মিটি মিটি হাসতে সুরু করেছে "কাদের ছেলে মেয়ে গো তোমরা? আমি যদি অসুর হই তোমরা যে কার্ত্তিক সরস্বতী গো। "ততক্ষনে আবও কয়েকজন এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে—"কি বলছ গো মোড়লের পো?

"—চল রে শংকর আমরা যাই। মা বকবে—" গৌরী আর দাঁড়ায় না, ভায়ের হাত ধরে একরকম টেনে নিয়েই তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চলে যায়।

—"কাদের ছেলে মেয়ে রে বেন্দা?"

—"বরেন দারোগার"—

—"পীত্তিমের মত সোন্দর দেখতে তাই না? যেন মা দুর্গার চালি থেকে নেমে এসেছে—"

—"তা হবে না মোড়ল! বরেন দারোগার রূপখানা একবার ভাব। শুনেছি তার বৌটাও নাকি দুগ্যো পীতিমের মত দেখতে।"

চারদিন ধরে কি ধূমের পূজোই না হয়েছিল! বলির সময় হলে দুর্গা, গৌরী আর শংকরকে নিয়ে ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন। বরেন মুখুজ্যে এসে ডাকেন—"কি গো বলি দেখবে না?"

—"না বাপু অত রক্ত দেখলে আমার শরীর অস্থির করে ওঠে। ঐ অত রক্ত নালা দিয়ে গড়িয়ে পদ্মার জলে গিয়ে পড়বে—বাব্বাঃ, ভাবলেও আমার মাথা ঘোরে—"

—"তা হলে তুমি ঘরে বসে থাক, শংকর আর গৌরী চলুক আমার সঙ্গে—"

—"না না অতটুকু ছেলে মেয়েকে অত রক্ত দেখিয়ে কাজ নেই—"

—"তা ছোট বয়েস থেকেই তো মানুষকে শক্ত করে গড়ে তুলতে হয়। যা দিনকাল পড়েছে ওইটুকু রক্ত দেখে অস্থির হলে চলে।"

একটা বলির মত বলি হয়েছিল সেবার। বলি দিতে দিতে মানুষগুলোও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। ছাগশিশুর আর্ত্ত চীৎকার, ঢাকের বাদ্যি সমবেত কণ্ঠে 'জয় মা দুর্গতিনাশিনী' ধ্বনি, সদ্য কাটা ছাগ শিশুর কবন্ধ দেহের রক্ত পিচকারীর মত করে সকলের গায়ে ছিটানো সব মিলিয়ে পরিবেশ কেমন যেন ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। মানুষের মনের মধ্যে একটা পৈশাচিক আনন্দ রস আছে। যা আগেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সেইজন্যেই বোধ হয় পাশের বাড়ীতে মানুষ মরেছে শুনলে লোকে ভীড় করে দেখতে যায়। কেউ গলায় দড়ি দিয়ে মরলে, রাস্তায় কাটা পড়লে, ট্রেনের তলায় শুয়ে আত্মহত্যা করলে, মনুমেন্ট অথবা কুতুবমিনার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লে মানুষ সব কাজ ফেলে আগে ছুটে যায় তাদের দেখতে। তারপর ফিরে এসে রসিয়ে রসিয়ে যেটুকু দেখেছে তার থেকে অনেক বেশী রং চড়িয়ে বর্ণনা করে অপরের কাছে। এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে তার নিজেরও কেমন একটা আত্মতৃপ্তি হয়। দুর্গার মত দরজা বন্ধ করে বসে থাকে এমন লোকের সংখ্যা আঙ্গুলে গুনে বলা যায়।

এ সব তো সেই কোন যুগ আগের কথা। যে বাড়ী রক্ষে করবার জন্যে উপেন পাকড়াশী এত কাণ্ড করেছিলেন সেই বাড়ীই কি

শেষ পর্য্যন্ত রক্ষে পেয়েছিল ? পায়নি। কোনও জিনিষই চিরদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না। অনুকূল ঠাকুরের সেই বিরাট আশ্রমও আজ নেই, উপেন পাকড়াশীর বাড়ীও আজ নেই। উপেন পাকড়াশীর যে ঘড়িঘর আর সূর্য্য মন্দিরের গায়ে এসে পদ্মা থমকে দাঁড়িয়েছিল, যার পাশের বাঁধানো নালা দিয়ে একদিন রক্তস্রোত বয়ে এসে পদ্মার বুকে ঝরে পড়েছিল সেখান থেকে পদ্মা আজ অনেক দূরে সবে গেছে। নাম মাত্র দামে উপেন পাকড়াশীর অত সাধের বাড়ী পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের কাছে বিক্রী করে তার উত্তরপুরুষেরা আজ কলকাতায় এসে বসবাস করছে।

সেদিন কিন্তু অষ্টভূজার মহিমা দেখে দেশের মানুষ তাজ্জব বনে গিয়েছিল। দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বারবার উচ্চারণ করেছিল—'জয় মা বিপদ্‌তারিনী—'। তা তাজ্জব হবারই তো কথা ! তা না হলে ঘড়ি শুদ্ধ যে টাউওয়ারটা পদ্মার বুকে ধসে পড়বার জন্যে কাত হয়ে গিয়েছিল, সেটা এই পাকিস্তান হবাব আগ পর্য্যন্ত ওই ভাবেই দাঁড়িয়েছিল। কত লোক দেখতে যেত—ওখানকার পুরানো বাসিন্দাদের কাউকে পেলে বসে বসে সেদিনের অষ্টভূজা পূজোর গল্প শুনতো।

সুপর্ণার চোখ থেকে উপছে পড়ল কয়েক ফোটা জল চশমার হাই পাওয়ার কাঁচের ওপর। চোখ থেকে চশমা খুলে হাতে নিলেন তিনি—রুমাল দিয়ে মুছতে লাগলেন চশমার কাঁচ।

—"এই শংকর আমি তোর দিদি না ? দিদি না বললে উত্তর দেব না।"

—"ইস্ দিদি না ছাই—ইন্দুদিদির খোঁপা আছে তোর খোঁপা আছে। তুই ইন্দুদিদির মত সাড়ী পরিস্ ?"

—"আহা রে ! —সাড়ী না পরলে আর দিদি হওয়া যায় না ? কি বুদ্ধি ছেলের। ঐ যে পাশের বাড়ীর মাষ্টী, ও কি শাড়ী পরে ? টুটুল ওকে দিদি বলে না ?"

—"ইস্! তাই বলে তোকে আমি দিদি বলতে পারবো না—"

—"না বললি তো ভারী বয়েই গেল আমার! আমি জজ কোর্টে যাচ্ছি আমার সঙ্গে এলে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব—"

—"বেশ করবো যাব—তোর কি একার রাস্তা?"

—"বেশ তবে তুইই যা; আমার আর গিয়ে কাজ নেই"—গৌরী লেপাপোছা কদম গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে পড়ে। শংকর কাঁদ কাঁদ মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে তারপর গৌরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

—"এ্যাই শংকর ভাল হবে না কিন্তু! ইস্ পাজী ছেলে চুল ধরে টানলে আমার লাগে না—না? দেব এক চড়ে গাল ফাটিয়ে—ভাই বোনে গজ-কচ্ছপ লড়াই সুরু হয়। দুর্গা এসে দুজনকে ছাড়িয়ে নিয়ে গৌরীর গালে ঠাস্ করে একটা চড় মেরে বলে—ছোট ভাই-এর সঙ্গে মারামারি করতে লজ্জা করে না? পাজী মেয়ে—কুটোটি ভেঙ্গে দুখানা করবে না কেবলই দস্যিপনা। যা—ঠাকুরমার ঘরে গিয়ে শাক কটা বেছে দিগে যা। বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলে শ্বাশুড়ী লোহা পুড়িয়ে ছ্যাকা দেবে—।"

মিস্ মুখার্জির মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। সেই সাত বছরের মেয়ে গৌরী এখন মিস্ সুপর্ণা মুখার্জি। আশ্চর্য্য! জগতে সব কিছুই কেমন ওলট পালট হয়ে যায়। গৌরী শাশুড়ীর কাছে লোহা পোড়া ছ্যাঁকা খাবে বলে দুর্গা কথায় কথায় ভয় দেখাতেন অথচ শ্বাশুড়ী বস্তুটির সঙ্গেই জীবনে তার পরিচয় হল না কোনদিন। ঠাকুমা কিন্তু ভারী ভালবাসতেন গৌরীকে।

—"নটে শাকের ঝাল খেতে খুব সুন্দর—তাই না ঠাকুমা?"

জগত্তারিনী দেবী বক্‌নোর গরম তেলে ফোড়ং ছেড়ে হাতা দিয়ে নাড়তে নাড়তে মৃদু হাসতেন। গৌরী চেয়ে থাকতো তেলের দিকে—"শাকগুলো ছেড়ে দাও ঠাকুমা, তেল জ্বলে উঠবে।" ছ্যাঁক কল কল শব্দ হোত শাকগুলো ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে।

—"তুমি সবটা ছেড়ো না ঠাকুমা—আমি একটু ছাড়বো"—

—"বাসি জামা কাপড়ে ধোয়া সবজিতে হাত দিতে নেই গৌরী। কাল থেকে আমার সঙ্গে নেয়ে নিস্, হাত দিতে দেব।"

—হ্যাঁ ঠাকুমা, তোমার শ্বাশুড়ী তোমায় ছ্যাঁকা দিয়েছে ?" রান্না করতে করতে জগত্তারিনী দেবী অবাক।

—"কেন রে, ছ্যাঁকা দেবে কেন ?"

—"আমায় দেবে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি"—গৌরীর মুখ থমথম করে।

"বালাই ষাট্! তেমন শ্বাশুড়ীর ঘরে আমি বেঁচে থাকতে তোকে পাঠাবো না—"

—"না পাঠিয়ে করবেই বা কি ? মেয়ে কি ঘরে রাখবার জিনিষ।"

—"মা গোঃ! কি পাকা পাকা কথা মেয়ের! এখনও সাত পেরিয়ে আটে পড়েনি এখনই মেয়ের শ্বাশুড়ীর চিন্তা।"

—"মেয়ে মানুষের আবার বয়েস! দশ বছরে পড়লেই তো গৌরী দান করবে। তখন যদি শ্বাশুড়ী ছ্যাঁকা দেয় তোমরা কিছু করতে পারবে ?"

—"তা শ্বাশুড়ী তোকে ছ্যাঁকাই বা দেবে কেন ?"

—"বাঃ দেবে না! কুটোটা দুখানা করতে শিখেছি আমি—"

—"তোকে অত ভাবতে হবে না গৌরী। তোকে আমি সব রান্না শিখিয়ে দেব। তোর শ্বাশুড়ী মাগীই তখন তোর কাছে নাকে খৎ খাবে।"

গৌরী মন দিয়ে বসে বসে রান্না দেখতে দেখতে এক সময় বলে—"একট পয়সা দেবে ঠাকুমা ?"

—"এই ভর দুপুরে পয়সা কি হবে রে ?"

—"এখন না, তুমি যখন খেয়ে উঠে সুপুরি খাবে তখন দিও।"

—"পয়সা আমার কাছে ঝুল পাড়ছে! তোর বাবা কি আমার

হাতে একটা পয়সা দেয় ? না আমার ভাতার জলের তলা থেকে উঠে এসে পয়সা দিয়ে যায় ?"

গৌরী ঠাকুমার আর একটু কাছে সরে আসে, ছোঁয়া বাঁচিয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে—"জান ঠাক্‌মা বাবা কিন্তু মাকে অনেক পয়সা দেয়। সেদিন এতগুলো রূপোর ঝকঝক টাকা দিল। তুমি মাকে ছ্যাঁকা দিলেই পার"—

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন জগত্তারিনী দেবী।

—"সেদিন কি আর আছেরে দিদু! এখন মায়ের চেয়ে মাগ হয়েছে বড়। আবাগীরা যেন ভাতারকে বাপের বাড়ী থেকে আঁচলে বেঁধে এনেছে! কলি ওলটাতে আর দেরী নেই—বুঝলি গৌরী!"

—"ঠাক্‌মা তোমার ভাতার তোমায় টাকা দিত না বুঝি ? বস তোমার শ্বাশুড়ীকে দিয়ে দিত—"

—"তুই থাম তো ছুঁড়ী। কেবল পাকা পাকা কথা—"

গৌরীর ঠাকুমার জন্যে বড় কষ্ট হয়। বিকেল বেলা শংকরের হাত ধরে বেড়াতে যায় গৌরী। জজ সাহেবের বাগানের মালীটার সঙ্গে ওর খুব ভাব। রোজ মালীর কাছ থেকে ফুল নিয়ে বাড়ী ফেরে। সেদিন ফুল চাইতেই মালী বলল—"রোজ রোজ ফুল দিয়ে কি কর খুকুমনি ? তোমাদের ফুল দিতে দেখলে সায়েব আর রক্ষে রাখবে না—আমার চাকরীটা খেয়ে নেবে।"

—"তোমার সায়েব তো আচ্ছা হিংশুটে ? এতো বড় বাগান, এত ফুল, নিলুমই বা দুটো, তোমার সায়েবের গাছ তো আর ক্ষয়ে যাবে না ?"

জজ সাহেবের বাগানের মালি গৌরীর কথা শুনে হাসে।

—"তা রোজ রোজ ফুল দিয়ে কি কর তুমি ?"

—"মা গো, ফুল দিয়ে লোকে কি করে তাও জান না ? এ দিকে এস, এস না একটু—বাস্ বাস্ এখান থেকেই দেখা যাবে।

এবারে আমাদের বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখ—"

মালি আবার হেসে ফেলে—"ফুল দিয়ে কি তুমি বাড়ী সাজাও ?

—"তুমি কি গো ? আমার ছোট ভাই শংকরও যা বলতে পারে তুমি তাও পার না। কিরে শংকর বল না ? বেচারার বুদ্ধি নেই বলে কি ওকে অচ্ছেদ্দা করতে আছে ?"

শংকর তুবার ঢোক গিলে বলে—"আমলা কদম গাত পূজো কলি—"

মালি হেসে উঠতেই গৌরী চটে যায়—"আয়রে শংকর আমরা চলে যাই। ফুল নিয়ে আর আমাদের কাজ নেই"—ভায়ের হাত ধরে যাবার জন্যে পা বাড়ায় গৌরী।

—"ফুল নিয়ে যাও, ও খুকু—"

—"না বাপু তোমার হাতের ফুলে পূজো হবে না। ঠাকুর দেবতায় ছেদ্দা নেই তোমার—"

—"ঠাকুর দেবতা আবার কোথায় পেলে খুকুমনি—"

গৌরী মালিটার দিকে একবার করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—"তুমি আর জন্মে মুসলমান ছিলে—বুঝলে ? আমার ছোট ভাই শংকরও জানে কদম গাছ দেবতা। কী রে শংকর জানিস নে ? বলে দে না, ও বেচারার ধম্ম জ্ঞান হয় নি। ধম্ম দিলে পূণ্যি হয়।"

শংকর ঘাড় কাত করে একটু হাসে। ওর তুগালে টোল পড়ে।"

—"কদম গাতে কিও থাকে। সন্দে বেলায় নূপুল পায়ে নাতে। আমলা ভোগ দিয়ে তোক্ বুঁদে থাকি, কিও পেথাদ খেয়ে দায়—" কথার মাঝখানেই শংকরকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে মালি। গৌরীর হাত ধরে বলে—"চল ফুল তুলে দি"।

আজ এতদিন পরেও সে সব দিনের কথা সব মনে পড়ছে স্বুপর্ণা মুখার্জির। বিরাট জায়গা নিয়ে পুলিশ লাইন। সুড়কি ঢালা যে লাল মাটির রাস্তাটা ঈশ্বরদি ষ্টেশন থেকে এঁকে বেঁকে ইছামতী নদীর কাঠের পুল পার হয়ে সহরে এসে মিশেছে ঠিক সেইখানেই

লাইন। একপাশে মস্ত বড় খেলার মাঠ আর একপাশে লাইন দারোগা আর সুবেদার সায়েবের কোয়াটার। তার একটু দূরেই সার সার লম্বা লম্বা ঘরের পুলিশ ব্যারাক। একপাশে সরকারী হাসপাতাল আর একপাশে খৃশ্চানদের কবরখানা। কবরখানার পাশ ঘেঁসে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই রিজার্ভ অফিস তারপরেই জজকোর্ট। দুপুরবেলায় জজকোর্টের সামনের চত্বরটায় লোক গিজগিজ করে। চানাচুর, বিসকুট, খুরমা, মুড়ি মুড়কী, কুলপী বরফ, বাদামভাজা, ছোলাভাজা নানারকম জিনিষ বিক্রী হয়। যারা মামলা মোকদ্দমা করতে আসে তারা কিনে খায়। জজকোর্টের সামনে হয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলে উচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা জেলখানা। শংকরের হাত ধরে গৌরী সারাটা দিন গোটা জায়গা টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। লাইন দারোগার ছেলেমেয়েকে সবাই চেনে। রিজার্ভ অফিসেই বরেন মুখুজ্যে কাজ করেন। সেখানেও গৌরীর আনাগোনা। অফিসের বাবুরা সবাই ওদের চেনে। খাতাটা, পেনসিলটা যাই দেখে তাই প্রয়োজন হয় গৌরীর।

"—তোমাদের তো এত্তো খাতা আমাদের দুজনকে দুটো দেবে?"

—"খাতা দিয়ে কি করবে গৌরী?"

—"ছবি আঁকব—"

—"তুমি ছবি আঁকতে পার?"

—"পারি নে আবার! কত ছবি এঁকে সেঁটে দিয়েছি কদম গাছে। শংকরও পারে ছবি আঁকতে। বল না শংকর! তুই কি আঁকতে পারিস। তোর হয়ে সব জায়গায় আমি অত বলতে পারিনে বাপু—"

শংকর গৌরীর শাড়ীর একটা খুঁট চেপে ধরে চোখ বড় বড় করে বলে—আমি দ'এল হোল জ্বল আঁকতে পালি—"

—"কী বোকা রে তুই! সেদিন যে তোকে মহাত্মা গান্ধীর ছবি আঁকতে শেখালাম—'

অফিস ঘরে যেন নীল আকাশ থেকে বিকট শব্দ করে বাজ পড়ল। আপাদ মস্তক চমকে উঠল আশপাশের সব কজন লোক। চকিত দৃষ্টিতে একবার এদিক ওদিক চেয়ে দেখল সবাই। ব্রিটিশ রাজের রিজার্ভ অফিসে গান্ধীজীর নাম উচ্চারণ কেউ শুনতে পেলে এক সঙ্গে এতগুলো লোকের চাকরী যাবে। তা তখন সেই যুগই চলছিল। মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রাগান ঘরে ঘরে চরকাকাটা, তাঁত বোনা, বিদেশী কাপড় পোড়ান। দলে দলে সব মদের দোকানে, বিলেতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করে আর পুলিশ এসে কয়েদী-দের গাড়ী করে তুলে নিয়ে দশ ক্রোশ বিশ ক্রোশ দূরে লোকালয় থেকে বহুদূরে ছেড়ে দিয়ে আসে রাতের অন্ধকারে। নে এখন না খেয়ে না দেয়ে সাপ পোকা মাকড়ের কামড় বাঁচিয়ে তিনদিনে চার দিনে ঘরে ফিরে আয়! স্বদেশী করা হচ্ছে! দেশ স্বাধীন করা হবে! নে এখন ঠ্যালা বোঝ! তা ওরাও কি কম নাকি। ভয় ডর কাকে বলে জানত না তখনকার ছেলেমেয়েরা। আজকালকার ছেলেদের মত ড্রেন পাইপ প্যান্ট পরে, বাহারী চুলের চূড়ো উঁচিয়ে কোমর দুলিয়ে অঙ্গভঙ্গী করে টুইষ্ট ড্যান্স করতেও জানত না ওরা। ওরা জানত দেশ স্বর্গের চেয়েও বড়। দেশের জন্য প্রয়োজন হলে জীবন বিসর্জন দেওয়া সকলের ধর্ম। দেশকে স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখেছে তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা। স্কুল কলেজের কচি কচি ছেলেরা দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে নিজেদের বুকের রক্তে দেশের মাটি উর্বরা করে তুলেছে। 'বন্দেমাতরম্' বলে একজন লুটিয়ে পড়েছে আর একজন স্বাধীনতার ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিয়েছে। পুলিশের গাড়ী যখন ওদের নামিয়ে দিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে রুলের গুঁতো দিয়েছে তখন ওরা উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়েছে। যেন কী একটা মজার খেলা করছে ওরা। 'সায়েব এত সহজেই কি আমাদের কাবু করা যায়!' আমরা যে ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীনের দেশের লোক গো!" একসঙ্গে সবাই চীৎকার করে উঠেছে—বন্দে মাতরম—

"গান্ধীজী কি জয়।" অন্ধকারের বুক চিরে ওদের চীৎকার আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ছেলেদের গায়ে বুটশুদ্ধ লাথি মেরে সঙ্গীন উচিয়ে ব্রিটিশ রাজের বাহনের দল চীৎকার করে উঠেছে —'ষ্টপ ননসেন্স'। সমবেত কণ্ঠে আবার ওরা চীৎকার করে উঠেছে—'বন্দেমাতরম—ভারত মাতাকী জয়।'

ওদের ওপর মারবার হুকুম দেওয়া হয়নি কাজেই ওরা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে গাড়ী নিয়ে ফিরে চলে যায়। ছেলেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে বনজঙ্গল মাড়িয়ে এগিয়ে চলে—

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে, রাত্রি-নিশীথে—যাত্রীরা হুঁসিয়ার
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।"

সে একটা দিন গেছে তখন। দেশই তখন মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। স্ত্রী, পুত্র, মা, বাবা ভাই বোন্ এমনকি নিজের জীবনের মায়াটুকুও বিসর্জন দিয়ে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশের কাজে। সেদিনের সে স্বাধীনতার আন্দোলনের যুগে কোনও ভেজাল ছিল না। স্বাধীনতার পবিত্র যজ্ঞ বেদীকে যারা কলুষিত করেছে তাদের নরেন গোঁসাই-এর মত মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে। কোন আশ্রয়ই তাদের রক্ষা করতে পারেনি। সেই বহু রক্ত, বহু ত্যাগ, বহু বিসর্জনের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীনতা অর্জন করেছি কিন্তু এই কি চেয়েছিলাম আমরা? কোথায় গেল সে দিনের সেই মানুষ। কোথায় গেল সে দিনের সেই বিবেকবোধ, ধর্মবোধ, দেশাত্মবোধ? কার পাশে আমাদের সেই সোনার ভারত, আজ দিনের পর দিন অন্ধকারের পথে এগিয়ে যাচ্ছে? আজ এতদিন পরে কলকাতায় ফিরে সুপর্ণা মুখার্জির মনে হয় তিনি যেন এক 'নো ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ডে' এসে দাঁড়িয়েছেন, তার আশে পাশে সামনে পেছনে একটা মানুষও চোখে পড়ছে না।

তিন

কোথায় গেল ভারতের সেই সব মানুষ? গান্ধিজী, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, কানাইলালের দেশের মানুষ আজ কোন বিষবৃক্ষের ফল খেয়ে তারা এমন বিষের পুতুলে পরিণত হয়েছে! কোথায় গেল তাদের সেই মন, দেশের মানুষ, দেশের আলোছায়া, দেশের সব কিছুকে আপন করে নেবার সেই দৃষ্টিভঙ্গি? এর জন্যে দায়ী কে? বিশ্বযুদ্ধ? দুর্ভিক্ষ? দেশভাগ? হয়তো সবগুলোই।

সেদিন গৌরীর কথায় বাঙ্গালী বাবুর দল আপাদমস্তক চমকে উঠেছিল। গৌরীর হাত ধরে কাছে টেনে এনে ফিসফিস করে বলেছিল—'ওসব কথা অফিসে বলতে নেই গৌরী—'

—"কোন্ সব কথা গো?"

—"ওই সব ছবিটবি আঁকার কথা—"

—"কেন গো, বলতে নেই কেন?"

—"ওসব স্বদেশী ওয়ালাদের নাম করলে সাহেবরা রাগ করে"

—তা করলেই বা রাগ। ওরা রাগ করবে বলে আমি ছবি আঁকবো না? আয়রে শংকর, আসলে খাতা না দেবার ফন্দি! ওঃ খাতা না দিলে যেন আমার ছবি আঁকা বন্ধ হয়ে যাবে। চল বাবার কাছ থেকে পয়সা নিই গে—"

বরেন মুখুজ্যের ছেলে মেয়ে অন্তপ্রাণ। কাজের ফাঁকে ছেলে মেয়েদের দেখতে পেলে ভালই লাগে তাঁর, তবু শাসন করতেও ভোলেন না তিনি।

—"গৌরী— ! আবার অফিসে এসে সবাইকে বিরক্ত করছ? যাও এখন বাড়ীতে।"

গৌরী—নড়ে না; চুপ করে বাবার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকে।

—"বাবা তোমার গায়ে কুটো পড়েছে। নামাও—নামাও না মাথাটা ঝেড়ে দি"—মাথা ঝেড়ে দিয়ে ছোট ছোট আঙ্গুল দিয়ে বাবার কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো ঠিক করে দেয় গৌরী—।

—"এবারে বাড়ী যা গৌরী—"

—"যাচ্ছি গো যাচ্ছি; তুমি কাজ কর না—আমি কি তোমার কোনও ক্ষেতি করেছি? বাবা আমাদের দুজনকে দুটো পয়সা দেবে?

—"পয়সা দিয়ে কি হবে এখন?"

—"জজ কোর্টে গিয়ে খুরমা কিনে খাব।"

দুজনকে দুটো পয়সা দেন বরেন মুখুজ্যে।—"যা এবার পালা—"

গৌরী তবু দাঁড়িয়ে থাকে।

—"আবার কি?"

—"না এমনি—"

"তা হলে যা এবার; আমায় কাজ করতে দে—"

—"জান বাবা, শীগগীরি কলি ওলটাবে—"

—"নাঃ মেয়েটা দেখছি বড্ড জ্বালালে—" পকেট ঘড়িটা বের করে সময় দেখেন বরেন মুখুজ্যে তারপর ফাইল পত্র গুছিয়ে তুলে রাখেন। অফিস বন্ধ হতে আরও মিনিট কুড়ি দেরী আছে। হেড ক্লার্ককে বলে ছেলে মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে আসেন অফিস থেকে। রাস্তায় নেমে হাসিমুখে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন—"কলি উলটাবে তোকে কে বললে রে?

গৌরীর মুখ থমথমে।

—"বাবা ঠাক্‌মার ভাতারকে তুমি দেখেছ?"

মেয়ের কথা শুনে থমকে দাঁড়ান বরেন মুখুজ্যে—"এসব কি ভাষা শিখেছ গৌরী? ছিঃ—"

গৌরীও অবাক হয় বাবার রাগ দেখে। তবুও গলায় জোর দিয়ে বলে—জান, আমি আর শংকর ছাড়া ঠাক্‌মাকে কেউ ভালবাসে না—"

—"আমিও ভালবাসি, আমার যে মা হয়"—মেয়ের কথায় আবার হেসে ফেল্লেন বরেন মুখুজ্যে।

—"ছাই ভালবাস। ভালবাসলে ঠাক্‌মাকে পয়সা দাও না কেন? ঠাক্‌মার ভাতার কি জলের তল থেকে এসে তাকে পয়সা দিয়ে যাবে?" মেয়ের কথায় হো হো করে হেসে উঠেন বরেন মুখুজ্যে।

দুই ভাই বোনে টো টো করে ঘুরে বেড়ায় সারাটা দিন। জজকোর্টের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা এঁকে বেঁকে সহরের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে ভাইবোনে মাঝে মাঝে অনেকটা পথ পেরিয়ে যায়। রিজার্ভ অফিসের পাশ দিয়ে দিয়ে, পুলিশ লাইনের পাশ দিয়ে, জেলখানার উঁচু প্রাচীরের গা ঘেঁসে রাস্তাটা অনেক দূর চলে গেছে। শংকর মাঝে মাঝে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে—"গৌরী ছ্যাখ কতদূর?"

—"তোর কাছে তো সবই দূর। এখান থেকে জজসাহেবের বাগানও অনেক দূর আবার হাসপাতালও অনেক দূর। পাগল কোথাকার—গৌরী এবার দশে পা দিয়েছে, শংকরের প্রায় আট। ওদের এখন নিজেকে খুব বড় মনে হয়।

—"জানিস শংকর! এবার আমাদের কালীপূজোর সময় দেশের বাড়ী যাওয়া হবে না।"

"ইস্ রে, তোমায় বলেছে"—অবিশ্বাসের ভঙ্গী করে ঠোঁট ওল্টায় শংকর।

"ঐ আনন্দেই থাক। বাবা ঠাক্‌মার কাছে বলছিলেন এবারে ছুটি পাবেন না। হিন্দু মুসলমানে মারামারি লেগেছে কিনা তাই এখন তার অনেক কাজ।"

পুলিশ লাইনের মাঠে তাঁবু পড়েছে সার সার। গুর্খা সৈন্য এসেছে ওখানে। জগত্তারিনী দেবী সব সময় নাতি নাতনীকে আগলে রাখেন।

"ঢ্যাং ঢ্যাং করে বাহিরে যেওনা গৌরী—দিনকাল ভাল নয়।"

গৌরীর মনে একটা আনন্দ আর কৌতূহল হয়। কেমন যেন গা ছম ছম করে। ওর মনে হয় কি ভয়ংকর মারামারিই না হিন্দু মুসলমানের মধ্যে। ঠাকুমার গা ঘেঁসে বসে বলে—"হ্যাঁ ঠাকুমা! আফতাব কাকা আমাদের লাঠি মেরে মেরে ফেলবে? আর বাবার আরদালী ফৈজু মিঞ? সে কি করবে?"

—"তোদের কাছে মুখ খোলবার জো নেই বাপু কথায় কথায় শতেক প্রশ্ন। সব মানুষই কি সমান হয় নাকি? আফতাব তো আমায় মা বলে। পালে পার্বনে মা বলে এসে দাঁড়ায়—তোর বাবাকে 'দাদা' বলে—ওদের কথা আলাদা।"

তা সেবারে শহরে সে কী আতঙ্ক। সব সময় বন্দুক ঘাড়ে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে গুর্খা সৈন্যরা। সকাল বেলায় ওরা তাঁবুর পাশে বসে ভোজালীতে ধার দেয়। রুটি সবজী বানায়। বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাই বোনে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখে।

—"খুব ধার, তাই নারে গৌরী? ওই দ্যাখ আমাদের হাত নেড়ে ডাকছে, চল পালাই—"

—"তুই বড্ড ভীতু শংকর। আমরা তো বাড়ীতে আছি ওরা আমাদের কি করবে?"

সেবারে কাগজে কত ছড়া বেরিয়েছিল।

—"চুপি চুপি সার পূজা ক'র নাকো গোল
বাজায়ো না শাঁক ঘণ্টা বাজায়ো না ঢোল-"

সত্যিই সেবার পূজোয় কোন ধুম হ'ল না। বিসর্জনের সময়ও হিন্দু মুসলমানে মারামারি হল। জগত্তারিনী দেবী ছেলেকে বলেন-"ও বরেন তুই ওসব গণ্ডগোলে যাস্ নে বাবা-"

"ভয় কি মা? আমার ওরা কি করবে? দেখছ না কত গুর্খা সৈন্য এসেছে। এবারে সব মিটমাট হয়ে যাবে।"

—"সেই ভাল বাবা। একসঙ্গেই যখন বাস করতে হবে তখন এত মারা মারি কাটাকাটি করলে চলে?"

তা সেই বারই গান্ধিজী এলেন পাবনায়। সাহেবদের ভয় উপেক্ষা করে রাস্তার তুপাশে লোক লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল।

বেলা তখন প্রায় এগারটা। একটা খোলা মটরে সদর রাস্তা দিয়ে গান্ধীজী চলে গেলেন সহরের দিকে-খালি গা, হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ঝুলেব খাটো ধুতি পরনে। কোমরে ঝুলছে একটা পকেট ঘড়ি। হাত জোড় করে নমস্কার জানাচ্ছেন তিনি তুপাশের জনতাকে।

—"বন্দে মাতরম-গান্ধীজীকী জয়-" তুপাশের জনতা গান্ধীজীকে স্বাগত জানায়। জগত্তারিনী দেবীও গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রাস্তার পাশে। তার আঁচল মুঠোয় চেপে বড় বড় চোখ মেলে গান্ধীজীকে দেখেছিল গৌরী আর শংকর। জগত্তারিনী দেবী হাত তুলে নমস্কার জানালেন গান্ধীজীকে। তাঁর দেখাদেখি শংকর আর গৌরীও তাদের ছোট ছোট হাত তুলে নমস্কার করল।

খুব ধীরে ধীরে গাড়ী চলছিল। চারপাশে মিলিটারী আর পুলিশ। গান্ধিজী যেন যাত্নদণ্ড বুলিয়ে সহরের সব অশান্তি মুছে দিয়ে গেলেন। হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী বন্ধনের একটা হিড়িক পড়ে গেল।—

রাম রহমন জুদা কর ভাই
মনটা খাঁটি রাখজী—

সবারই মুখে মুখে তখন এই গান। কোথায় গেল হিন্দু মুসলমানে মারামারি—আর কোথায় কি ?

যুগান্তব আর অনুশীলনের যুগ তখন। একদিকে সন্ত্রাসবাদ আর একদিকে অসহযোগ আন্দোলন। সেই যুগের আলো বাতাসেই ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে তুটি ভাই বোন।

গান্ধীজির বাণী তখন দেশের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—"মুক্ত হও, ক্রীতদাস থাকিও না।" সমস্ত দেশ তখন আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। পদদলিত, অধঃপতিত জনসাধারণ সহসা মেরুদণ্ড সোজা করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সারা ভারতবর্ষে বিশেষ

ভাবে বাংলা আর যুক্তপ্রদেশে কারাদণ্ডের ধূম পড়ে গেছে। কারাযাত্রী অজস্র সেচ্ছাসেবকের যেন শেষ নেই। যারা কোনদিন রাজনীতি করেনি তারাও জনসাধারণের উৎসাহের স্রোতে এগিয়ে আসে কারা-বরণ করতে। গান্ধীজী তাঁর অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন তখন—"আমার বিশ্বাস অহিংসা হিংসা হইতে বহুগুনে শ্রেষ্ঠতর। অহিংসা কেবল মুনিঋষিদের ধর্ম নহে ইহা সাধারণ মানুষেরও ধর্ম। বল প্রয়োগ পশুর ধর্ম অহিংসা। যেখানে শাস্তি দেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শাস্তি দেওয়া হয় না, ক্ষমা সেখানেই।" গান্ধিজীর অহিংসা নীতিতে অনুপ্রানিত হয়ে ভারতের শত সহস্র নরনারী অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর একদিকে অনুশীলন সমিতি ব্যাপক এবং সুনিয়ন্ত্রিত বিপ্লবের জাল বিস্তার করে ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করে ব্রিটিশ সরকারকে উদ্ব্যাস্ত করে তুলল। অন্যদিকে তখন চলছে ব্রিটিশ সরকারের ধ্বষণ নীতি। ছোট বড় নেতারা প্রায় সকলেই কারাগারে।

দেশের নেতারা ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজ বর্জন করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলা দেশের ছাত্র সমাজ রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বাংলা দেশে তখন ছোট বড় যতগুলি বিপ্লব সমিতি ছিল পুলিন বিহারী দাসের অনুশীলন সমিতি তার অন্যতম। এই অনুশীলন সমিতির সহস্রমুখী কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাসে রাউলাট্ কমিটির রিপোর্ট ভরপুর। বিপ্লববাদীরা অসহ-যোগ আন্দোলনে দেশের মুক্তি আসবে এ বিশ্বাস না করলেও এই পথে যে দেশের অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে একটা রাজনৈতিক চেতনা এবং দেশাত্মবোধ জেগে উঠবে এটা মনে প্রানে বিশ্বাস করতেন।

ঋতু বদল হয়, সঙ্গে সঙ্গে রীতি বদল।

গৌরীর পিছু পিছু প্রায় ছুটতে ছুটতে শংকর উঠে এল।—"এই গৌরী প্লিজ—"

—"এ সবের মানে কিরে শংকর? কে ঐ ছেলেটা? ওকে কি দিলি তুই?

—"কি দিলুম তা তো তুই দেখেছিস্ গৌরী। কিন্তু কথা দে আর কাউকে বলবি নে।"

শরৎকালের সকালবেলার মত হেসে ওঠে গৌরী।

—"আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি নে শংকর; ছেলেটি কে?"

—"ও ভাস্করদা। আমাদের পাড়াতেই থাকে, ক্লাশ টেনে পড়ে, কি সুন্দর ছবি আঁকে—"

—"তাই অমন কবি কবি চেহারা। তা তোর সঙ্গে অত ভাব হ'ল কি করে? বাবার বন্দুক রিভলবারের লাইসেন্স বই দিয়ে ও কি করবে বলত?"

—"এ্যাই গৌরী আস্তে। যা তো এটা মার বাক্সে চুপচাপ তুলে রেখে আয়—"

"—আমার বয়ে গেছে। চাবী চাইতে গেলে মা এখনই পাঁচ সাতটা প্রশ্ন করবেন।"

—"বাক্স খোলাই আছে, ইচ্ছে করেই বন্ধ করিনি। মা মনে করবেন নিজেই বন্ধ করতে ভুলে গেছেন—"

"বাব্বাঃ পাকা চোর"-খিলখিল করে হেসে ওঠে গৌরী, শংকরও হাসে।

এমনি করেই একদিন সুরু হয়েছিল। দরজার আড়ালে নিজেকে গোপন করে গৌরী ভাস্করকে দেখত টিয়াপাখী রংএর সাড়ীর আঁচল দাঁতে কামড়ে। ওর দুচোখের দৃষ্টি থমকে থাকে ওর ওপর। সাড়ীর আঁচল দাঁতে কাটছে আর ভাস্করকে দেখছে গৌরী। কি সুন্দর ছেলেটি! টানা টানা চোখ। গৌর বরণ। ঘন কৃষ্ণ কোঁকড়া চুল, জোড়া ভুরু, টিকালো নাক। দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। হঠাৎ ও যেন চমকে ওঠে, শিউরে ওঠে। লজ্জায় লাল হয়ে যায় ওর মুখ। দৌড়ে পালিয়ে আসে ওখান থেকে।

দুর্গার কোলে তখন আরও দুটি এসেছে—শেখর আর সীমা। সংসার নিয়ে একদণ্ড বিশ্রাম নেই দুর্গার—সেই সঙ্গে গৌরীর। বার তের বছর বয়সেই পাকা গিন্নী হয়ে উঠেছে ও। আসন পিঁড়ি হয়ে বসে আটমাসের সীমাকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়ায়। সীমার দুধ খেতে আপত্তি, ও চীৎকার করে হাত পা ছোঁড়ে। কাঁসার বাটির তায়ে ঝিনুক বাজিয়ে ওকে ভোলাতে চেষ্টা করে গৌরী। শব্দের তালে তালে ছড়া কাটে—

'আয় চাঁদ আয় বাটি ভরে দুধ দোব
রূপোর থালায় ভাত দোব
রুই মাছের মুড়ো দোব
সুখ শয্যা পেতে দোব
সুখে নিদ্রা দিবি
আম কাঁঠালের বাগান দেবো
ছায়ায় ছায়ায় যাবি'

—"দে-দে আমার কাছে দে—তুই পারবি নে। তুই বরং মাছের ঝোলটা দেখ। ঝোলটা ঘন হয়ে এলে নামিয়ে ঢেলে দিস্ কাঁসিতে।"

কোন কিছুতেই আপত্তি নেই গৌরীর। চাকর রামু মশলা পিষতে পিষতে বলে—"বেশী তুড়ুং ভুড়ুং করো না দিদিমনি, গরম কড়াই উল্টে পুড়ে মরবে।"

—"তুই থাম তো রামুদা—দেব মাকে বলে—'

—"দিদিমনি তুমি বরং এইদিকে সরে এস আমি ঢেলে দিই ঝোলটা। অতবড় কড়াই নামাতে গিয়ে পুড়ে ধুড়ে গেলে তখন আর বিয়ে হবে না।"

রামুর কথায় গৌরী গালে হাত দেয়—"ওমা আমার কি হবে? তুই বল্‌ছিস্ কি রে রামুদা? তুই না শুদ্দুর? বামুনের রান্নায় হাত দিবি তুই।"

—"তা বটে !" রামু মুখ কাঁচুমাচু করে বলে—তা হলে সাবধানে নামাও গৌরী দিদি—অত বড় কড়াই।"

লেখা নেই পড়া নেই শুধু সংসারের কাজ। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ শেষ করে পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে সংসারের কাজ শিখছে গৌরী। জগত্তারিণী দেবী বলেন—'অত লেখাপড়া শিখে কি হবে বাপু? মেয়ে কি তোর হাইকোর্টের হাকিম হবে? এখন থেকেই ছেলে খোঁজ বরেন তা না হলে বিয়ে দিতে দিতে মেয়ের বয়স পেরিয়ে যাবে।' মায়ের কথায় বরেন মুখুজ্যে হাসেন, বলেন—"অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা? শোননি দেশে 'সাবদা' আইন পাশ হয়েছে।"

সন্ধ্যে বেলায় কোন কাজ নেই গৌরীর। জগত্তারিণী দেবীর একটু আফিং খাবার অভ্যেস। সন্ধ্যেবেলার আহ্নিক সেরে মুসুরির দানার মত একটু আফিং খেয়ে বিছানার ওপর এসে বসেন তিনি। গৌরীও এসে বসে সেই সময়। ঠাকুমার পাশে শুয়ে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলে—'একটা গল্প বল ঠাক্‌মা।'

মেটে তেলের আলো জ্বলে দেওয়াল গিরিতে। রাধাকৃষ্ণের প্রনয় কাহিনী শুনতে শুনতে গৌরীর মন উদাস হয়ে যায়। একসময় বলে—'আচ্ছা ঠাক্‌মা রাধাকে যদি কেষ্ট অতই ভালবাসতো তা হলে ছেড়ে গেল কেন?'

"ঠাকুর দেবতার লীলা ওকি আমরা বুঝতে পারি।"

"লীলা না ছাই! কাউকে দুঃখ দিয়ে বুঝি লীলা করা যায়।"

"ওরে চুপ-চুপ। ঠাকুর দেবতার কথা নিয়ে অমন করে বলতে নেই ওতে পাপ হয়।"

গৌরী আর কিছু বলে না; কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঠাকুমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে—"ঠাক্‌মা গো, সেই মনিপুরের রাজার মেয়ের গল্পটা বল না!"

"সে গল্প তো কতবার শুনেছিস্ রে।"

"তা হোক্ আবার বল"

মনিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। ধরণ ধারণ সব ব্যাটা ছেলের মত। পুরুষের মত সাজ সজ্জা। তীর ধনুক নিয়ে বনে জঙ্গলে শিকার করে বেড়ায়। সেই মেয়েই একদিন ব্রহ্মচারী অর্জুনকে দেখে মুগ্ধ হলেন। অর্জুন তখন মনিপুরের জঙ্গলে অজ্ঞাতবাস করছে। চিত্রাঙ্গদা সোজা-সুজি অর্জুনের কাছে গিয়ে বললেন আমায় বিয়ে কর। অর্জুন তখন বার বছরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করছেন। বিয়েতে তিনি রাজী হলেন না। চিত্রাঙ্গদার মনে খুব দুঃখ হল, অভিমান হল—তিনি বনে গিয়ে মদন দেবের তপস্যা আরম্ভ করলেন। মদনদেব তার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিলেন—'তুমি অর্জুনকে বশ করবে।' মদন-দেবের বরে দেখতে দেখতে চিত্রাঙ্গদা অপরূপ সুন্দরী হয়ে গেলেন। তার চারদিকে ফুল ফুটে উঠল, ফুলে ফুলে ভ্রমর গুন গুন করে মধু খেতে লাগল। গাছে গাছে কোকিল ডেকে উঠল। ব্রহ্মচারী অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে দেখে মুগ্ধ হলেন, চিত্রাঙ্গদার বশ হয়ে তাকে বিয়ে করলেন। কিন্তু তবু চিত্রাঙ্গদার মনে শান্তি নেই—

—"কেন ঠাক্‌মা ? অর্জুনকে বিয়ে করেও চিত্রাঙ্গদার মনে শান্তি নেই কেন ?"

--"ও মা শান্তি থাকবে কি করে ? তিনি তো অর্জুনকে ছদ্মবেশ করে ঠকিয়েছেন। আসলে তো তিনি অত সুন্দরী নন। তার মনে ধিক্কার এল। তিনি আবার মদন দেবের তপস্যা আরম্ভ করলেন। মদনদেব এসে জিজ্ঞাসা করলেন--'আবার কি চাও ?' মদনদেবের পায়ে লুটিয়ে পড়ে চিত্রাঙ্গদা বললেন--'হে ঠাকুর ! আমার ছদ্মবেশ তুমি ফিরিয়ে নাও। এ মিথ্যে থেকে আমায় মুক্তি দাও। মিথ্যা দিয়ে আমি অর্জুনকে ভোলাতে চাইনে।' 'তথাস্তু' বলে মদনদেব চলে গেলেন।

—"এ মা তা হলে তো এবার অর্জুন পালিয়ে যাবে চিত্রাঙ্গদাকে ফেলে—"

—"না-রে-না ; তাই কি পালায়। চিত্রাঙ্গদার সত্য পরিচয়

পেয়ে অর্জুন নিজেকে ধন্য মনে করলো।"

—হ্যাঁ ঠাকমা! তুমি কখনো মণিপুরে গেছ?

—"অনেকদিন আগে একবার গিয়েছিলাম বেড়াতে। দেশ তো নয় স্বর্গ! পাহাড় আর পাহাড়। তারই গায়ে গায়ে পাক খেয়ে চলে গেছে আঁকা বাঁকা রাস্তা। রাস্তার একপাশে খাদ, অন্যপাশে পাহাড়। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে ছোট বড় ঝরণা। রোদ রোদ পড়ে সে কি সুন্দর লাগছে দেখতে। যেন গলানো রূপোর নদী। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধানের ক্ষেত আর জঙ্গল। পাহাড় আর জঙ্গল, জঙ্গল আর পাহাড়। তার যেন শেষ নেই।"

--"ওখানকার লোক খুব নাচতে পারে তাই না ঠাক্‌মা?"

--"মণিপুর যে নাচেরই দেশ। কত দেশ দেশান্তর থেকে ওখানে লোকে নাচ দেখতে আসে, নাচ শিখতে আসে। আমাদের দেশে যেমন পূজোয় নৈবিদ্য দিতে হয় ওদের দেশে তেমনি পূজোর সামনে নাচতে হয়। ছোট বেলা থেকেই ওরা নাচ শেখে। রাস, গোষ্ঠ, কীর্ত্তন। ওদের ধারণা কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণ, রাধা, তাদের সখা, সখী এই সব সাজে তা হলে তারা পরকালের পথে অনেক এগিয়ে যায়।"

—"তুমি ওদের নাচ দেখেছিলে ঠাক্‌মা?"

—"ও মা নাচ না দেখলে ওখানে যে যাওয়াই মিথ্যে--"

—"বল না ঠাক্‌মা, কি নাচ দেখেছিলে। ভারী ভাল লাগছে আমার। আচ্ছা ঠাক্‌মা ওখানে আমাদের মত ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আছে?"

জগত্তারিনী দেবী হেসে দুহাত দিয়ে নাতনীকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন "কথাটা তুললিই যখন, বলি শোন। আমরা যখন বাসে করে পাহাড়ে উঠছি হঠাৎ দেখি বাসের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে একটা ছোট্ট মেয়ে খিলখিল করে হাসছে। টুকটুকে রং, কপালের ওপর ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, পরনে লুঙ্গি আর হাতে পান সুপুরি। বাস থামতেই মেয়েটি ড্রাইভারের হাতে পান সুপুরি

গুঁজে দিয়ে ওর পাশে গিয়ে বসল। পান সুপুরি দেবার অর্থ হাতে পয়সা নেই কিন্তু বাসে যেতে হবে। ওরা অত্যন্ত সরল চক্ষুলজ্জা কাকে বলে ওরা জানে না।"

—"এবারে তুমি নাচের গল্প বল ঠাকুমা--"

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ; জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক ওদের নাচ সুরু হল। শাঁক বেজে উঠল তার সঙ্গে বাঁশীর সুর। শ্রুতিধর গান ধরলেন। হাতে মন্দিরা, মুখে শান্ত ভাব। সুরু হ'ল মৃদঙ্গের বোল—'থৈ থৈ-তা তা'। হাতে বাঁশী পরণে পীতবাস, চন্দন চর্চ্চিত দেহ শ্রীকৃষ্ণ আসরে এসে দাঁড়ালেন। তারপর চলল মৃদঙ্গের বোলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাচ। চারদিক তখন একেবারে চুপচাপ কেবলমাত্র শ্রুতিধর গাইছেন যার অর্থ হল---'শ্রীরাধা তার সখী পরিবৃতা হয়ে গোপনে পথ অতিক্রম করে এগিয়ে আসছেন।' রাসমণ্ডপের পথ ধরে সখীরা শ্রীরাধাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। সখীদের সংখ্যা প্রায় চব্বিশ পঁচিশ জন। পরনে ঝকঝকে শক্ত ঘাগড়া, আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। মাথার চূড়ায় কেবল শ্রীরাধার সঙ্গে সখীদের পার্থক্য। একই ভঙ্গীতে, একই রকমে, সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ওরা এগিয়ে আসছে। একই সঙ্গে হেলছে, দুলছে, তালে তালে। তারপর মণ্ডপে এসে কয়েকবার চক্রাকারে ঘুরে নিল। মনে হ'ল যেন বসন্তের বনে ঝড় উঠেছে। তারপরই আবার সকলে হেলে পড়ল, মনে হল ঝড়ের গতি কমে এসেছে, তারপর আবার মৃদঙ্গে ঘা পড়ল। সখীরা একসঙ্গে নাচ সুরু করল। সখীদের অতগুলো হাত একই সঙ্গে উঠছে নামছে, একই তালে একই ছন্দে। মনে হচ্ছে ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে ওরা হেলছে দুলছে। শ্রীকৃষ্ণকে না দেখে শ্রীরাধা বিরহ বেদনায় মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন। সখীরা শ্রুতিধরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিলাপ করছেন 'হায় হায় কি হল? সখীর আমার কি হল? সুর বড় করুণ। প্রতিটি মূর্চ্ছনা, প্রতিটি রেশ যেন কেঁপে কেঁপে আবহাওয়াকে ব্যথাতুর করে তুলছে। বেদনায় যেন সমস্ত

আবহাওয়া জমাট বেঁধে গেছে। প্রায় সকলেরই চোখে জল। মৃদঙ্গের বোল ব্যথার আবেগে কাঁপছে।

কি করে যে এতটা সময় কেটে গেছে টেরও পাইনি। মৃদঙ্গের বোলে আবার যেন আনন্দের আহ্বান। শ্রুতিধর শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করছেন। সমবেত কণ্ঠে গান কানে আসতেই দেখি ফাগের থালা হাতে সখীরা সব এগিয়ে আসছে। ওদের নাচে আগের সে ব্যাথার ভাব নেই। শান্ত সমুদ্রে যেন জোয়ার এসেছে সমবেত, বিষন্ন, স্তব্ধ, জনতার মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন। শ্রীকৃষ্ণ আবার ফিরে আসছেন।

'সব দুখ আজি গেল দূরে
হারান রতন পাইলাম কোরে।
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান
ভ্রমর ধরুক আপন তান
মলয় পবন বহুক মন্দ
গগনে উদয় হউক চন্দ।'

হে কৃষ্ণ! তুমি ফিরে এসেছ আর আমার কোন দুঃখ নেই হে মাধব! বহুকাল পরে তুমি আমার গৃহে এসেছ, আজ আমার গৃহকে গৃহ বলে মনে হচ্ছে, আজ আমার দেহকে দেহ বলে মনে হচ্ছে। হে কৃষ্ণ! হে মাধব! আমি তিল তুলসী দিয়ে আমার সব সত্ত্ব তোমার চরণে সমর্পন করলাম।

আশ্চর্য্য! আজ এতদিন পরে হঠাৎ কেন এমন করে মনে পড়ছে ভাস্করকে। সুরেন্দ্র ব্যানার্জির ষ্ট্যাচুর নীচে কতবার ভাস্করের সঙ্গে দেখা হয়েছে গৌরীর। কথা বলবার, বেড়াবার, আলোচনা করবার খবরাখবর দেবার সব কিছুরই তো আস্তানা ছিল এটা পাবনা কলেজ থেকে বি এ পাশ করে কলকাতায় এসে আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিল ভাস্কর। আর্ট স্কুলের সেরা ছেলে ভাস্কর এই ষ্ট্যাচুর নীচে বসে বসেই স্কেচ্ করত। গৌরী এসে দাঁড়াত ওর পেছনে। ওর

ইচ্ছে হোত ভাস্করের চোখ দুটো দুহাত দিয়ে চেপে ধরে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকত ভাস্করের পেছনে। মুখ না তুলেই ভাস্কর, বলত- "সামনে এসে বস"—

গৌরী হেসে উঠত খিলখিল করে—"দেখতে পেয়েছ আমায়"

—"দেখতে পাইনি-গন্ধ পেয়েছি"

—"তাব মানে? আমি কি গন্ধ মেখে এসেছি তোমার কাছে?"

—"সে কথা কে বলেছে?"

"তা হলে গন্ধ কিসের?"

—"বাঃ গন্ধ থাকে না সব কিছুর?" পাশ দিয়ে একটা ছুঁচো গেলে যদি গন্ধ পাওয়া যায় তাহলে একটা মানুষ এসে দাঁড়ালে গন্ধ পাওয়া যাবে না?

—"এই ভাল হবে না বলছি। যা তা বললে আমি এক্ষুনি চলে যাব।"

ভাস্কর চট করে ঘুরে বসে। হাসিমুখ তুলে গৌরীর দিকে চায়। —"বাঃ সুন্দর। একমিনিট গৌরী। নড়ো না-প্লিজ--"

কাগজের ওপর পেনসিলের আঁচড় টানে ভাস্কর।

—"ইস্ আমার বয়ে গেছে দাঁড়াতে। আমায় কি তোমার মডেল পেয়েছ?

—"বা রে তা কেন?" ক্ষিপ্র হাতে কাগজের ওপর পেনসিলের টানগুলো দিতে থাকে ভাস্কর। ---ব্যাস হয়ে গেছে---।

—এখানে বড্ড ভীড় গৌরী; চল ইডেন গার্ডেনের সেই পুলটার ধারে গিয়ে বসিগে—"ভাস্কর হাসে। ওর কালো টানা টানা স্বপ্ন ভরা চোখ দুটোও হাসে। গৌরী হঠাৎ বলে ওঠে-তোমার চোখ দুটো ভারী সুন্দর।"

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্ মুখার্জি। ওর চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। অদৃশ্য অতীত যেন বারবার

ওকে আকর্ষন করছে নিজের দিকে। হঠাৎ রাজপথে একটা দোতলা বাস বিশ্রী শব্দ করে থেমে গেল। চারিদিক থেকে একটা চীৎকার কানে এল---"গেল---গেল---গেল"---। তারপর আবার সব চুপচাপ। হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পান মিস্ মুখার্জি উত্তেজনায় তার হাত পা কাঁপতে থাকে। কিছুদূরে দীর্ঘ দেহ কৃষ্ণকায় ট্যাকসি ড্রাইভার ওর দিকে সাপের দৃষ্টিতে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে ওর হাতের জ্বলন্ত বিড়ির আগুন দেখা যাচ্ছে।

বাস্তব! কল্পনার স্বপ্ন থেকে আবার কঠিন বাস্তবে এসে দাঁড়ান সুপর্ণা মুখার্জি। সাবধানে পথ চলতে না পারলেই এ্যাকসিডেন্ট; এখুনি বোধ হয় ওই 'গেল-গেল' শব্দের মধ্যে দিয়ে এমনি একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

"—এনি হেলপ ম্যাডম?" বিড়ি হাতে লোকটা খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ তুলে চাইলেন মিস্ মুখার্জি। লোকটার আপাদ মস্তক একবার চোখ বুলিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন— "দরকার নেই। তারপর বাড়ীর সদর দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন।

চার

এই নিষ্ঠুর জগতে মানুষের মনে প্রেম এল কোথা থেকে। এ কি শুধু নিয়ম, শুধু প্রকৃতির খেয়াল! সামান্য তুচ্ছ বলে মানুষ একদিন যা জীবন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, জীবন সায়াহ্নে এসে দাঁড়িয়ে সেই ফেলে দেওয়া তুচ্ছ জিনিসটির জন্যই তার মন প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। সুখের জন্য প্রেম নয়, প্রেমের জন্যই প্রেম। এ প্রেম আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দেব। তোমাকেই যে আমি ভালবাসি, তুমিই আমার প্রকৃতি, তুমিই আমার পূজা। তোমারই

জন্যে আমি যুগে যুগে এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি। আমার সকল আরম্ভের তুমিই আরম্ভ, আমার সকল শেষের তুমিই শেষ।

"লিখতা হুঁ ম্যায় তেরে নাম খুনসে
ইয়ে সাহী না সমাঝ না ;
মরতা হুঁ ম্যায় তেরে ইয়াদ্ মে
ইয়ে জিনা না সমাঝ না।"

আমি রক্ত দিয়ে তোমার নাম লিখে চলেছি একে কালী বলে যেন ভুল করো না। তোমার স্মৃতির অতলেই আমি ডুবে আছি একে বাঁচা বলে ভেবো না।

আজ রাতে কেমন যেন একটা নাটকীয় উৎকণ্ঠা জমে আছে ঘরের মধ্যে। বাইরে নিবিড় জ্যোৎস্না। সুন্দর হাওয়া বইছে। বারান্দায় অনেকগুলো টবে সুগন্ধি ফুল ফুটেছে। ত্রিযামা যামিনীর নিঝুম নীরবতা থমথম করছে ঘরের মধ্যে।

প্রেম লীলা, মিলন, বিরহ সবই কি বৃন্দাবনের ? হ্লাদিনী কি এই ঘরের মধ্যেই বিরাজ করছে না ? কালিন্দীকূলে, কদম্ব মূলে চার চোখের মিলন কি শুধু রাধাকৃষ্ণের ? আজকের যুগে যে মেয়েটি তার মৌন প্রেম নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে কি মহাভারতী শ্রীরাধার ছায়া নয় ? কাকে দেখবে মানুষ ? যাকে ধ্যানে দেখা যায় না যাকে চোখে দেখা যায় ? মানুষের মুখই কি ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব নয় ? মানুষকে ভালবেসেই কি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায় না ?

সুপর্ণার ছলছল বিহ্বল দু চোখের দৃষ্টি থমকে থাকে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে নিঝুম রাতে। তন্দ্রায় ছেদ পড়ে বারবার। চোখে ঘুম, তবু ঘুম আসতে চায় না। জীবনটাই যেন একটা জুয়ো খেলা। জীবন ধারণের জন্যে আমরা যখন এক জায়গায় জড়ো হই সেটাই বুঝি জুয়োর আড্ডা। হার হবে কি জিৎ হবে, না জেনেই অনেক ঝুঁকি নিতে হয়, অনেক অভিযানে যাত্রা করতে হয়।

আশ্চর্য্য ! আজ এতদিন পরে একটার পর একটা অতীতের ঘটনা

ওর মনের পর্দায় ছায়াছবির মত ভেসে উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে অথচ ওর আজকের জীবনের সঙ্গে সে দিনের কোনও মিল নেই, কোন সামঞ্জস্য নেই। ছকে বাঁধা ঐক ঘেয়ে জীবন। অফিস আর বাড়ী, বাড়ী আর অফিস। এ যেন জীবন ধারণের জন্যে চাকরী করা নয়, চাকরীর জন্যেই জীবন ধারণ করা। একদিন সে চাকরী নিয়েছিল সংসার কে বাঁচাবার জন্যে।

আজ একে একে ওর জীবন থেকে সবাই সরে গেছে। সকলেই আজ নিজের নিজের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। আজ বরেন মুখুজ্যেও নেই, দুর্গাও নেই। দুজনেই এ সংসারের পাট সেরে চলে গেছেন।

জগত্তারিনী দেবীরও আর পয়সার দরকার হয় না। তিনিও আজ সব হিসেব নিকেশের বাইরে। সুপর্ণা আজ মুক্ত। সামনে, পেছনে, আশে পাশে, কোথাও কোন বন্ধন নেই। আপন বলে দাবী করবারও কেউ নেই তার। আজ সে সম্পূর্ণ একা ও সম্পূর্ণ স্বাধীন। সে এখন যা খুশী করতে পারে, যেখানে খুসী যেতে পারে, যাকে খুসী নিয়ে ঘর বাঁধতে পারে, যাকে খুসী নিয়ে অতলে তলিয়েও যেতে পারে। কেউ তাকে বাধ দেবে না কেউ তার পথ আগলে দাঁড়াবে না। আজ বাস্তব জীবনের ঘাত প্রতিঘাত তাকে অচেতন করে তুলেছে বাস্তববাদী করে তুলেছে, কিন্তু সেদিন তার মন ভাবে আবিষ্ট ছিল। ভাস্করকে সে তখন একটা ব্যক্তি বিশেষ বলে মনে করত না। ভাস্কর ছিল তার অন্তরের একটি ভাব। সৌন্দর্য্যে, প্রেমে তাকে মধুর এবং পবিত্র করে তোলবার জন্যেই যেন তার জন্ম। তার প্রাণের নিভৃত নিকেতনে শতদল পদ্মের মতই ভাস্করের আবির্ভাব।

গৌরীর মুখখানা রক্ত গোলাপের মত রাঙা হয়ে উঠেছে। ওর সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে তারও চোখে সেই একই বিস্ময়। গৌরীর আনত মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভাস্কর! কটি মুহূর্ত্ত। তারপরই নিজেকে সামলে নিল দুজনেই। চলে গেল নিজের নিজের পথে। প্রথম দিনের দেখা এই ভাবেই। এর পর

ওদের দেখা হওয়াটা নিত্যি নৈমিত্তিক হয়ে উঠল। একটা অদ্ভুত নেশা—একটা তীব্র আকর্ষন। গৌরীর দীর্ঘ পল্লব আবেগভরা চোখ দুটি একটা বিষন্ন ক্লান্তিতে থতমত করত। অপরাধ করেনি তবু ওর নিজেকে অপরাধী মনে হত।

অনেক পথ অতিক্রম করে আসবার পর সুপর্ণার মনে হয়েছে কিসের প্রয়োজন ছিল এ সবের। সুপর্ণাও তো আর পাঁচ জনের মত জীবন কাটাতে পারতো। তার কিশোর বয়সে যারা তাকে কাঁদিয়ে ছিল, হাসিয়েছিল, যারা তার অন্তরের সুর লুট করে নিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল আজ তারা কেউ বা নদীর বাঁকে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা ঘরের কোনে, কেউ বা পথের বাঁকে হারিয়ে গেছে। তারা চলতে চলতে শুধু দুটো কথা বলবার সময় পেয়েছিল, সব কথা বলবার সময় পায়নি। তারা কাল স্রোতের মাঝখানে বাঁধ দেবার চেষ্টাও করেনি তারা শুধু ঢেউ এর ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। ভোর বেলার শুক তারার মত তারা সকাল না হতেই অস্ত গেছে! কিন্তু তার কপালে একটু খানি আলোর টিপ পরিয়ে দিয়ে যারা অস্ত গেল তারা তো ক্ষণিকের নয়, তারা যে চিরদিনের। আজ জীবনের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েও ওর মনে হচ্ছে তাদের ও চিনেছে, জেনেছে, পেয়েছে। ওরা ছিল, ওরা আছে, ওরা থাকবে।

গৌরী তখন দেশ নেতাদের নামও ভাল করে জানত না। গান্ধীজী, পণ্ডিতজী অথবা সুভাষ বোসকে নিয়েও ওর কোন মাথা ব্যথা ছিল না। বরেন মুখুজ্যে দেশ নেতাদের ছবি খবরের কাগজ থেকে কেটে নিজের ডায়েরীতে আঠা দিয়ে সেঁটে রাখতেন। প্রতিদিন অত্যন্ত গোপনে বসে বসে ডায়েরী লিখতেন, কারও কিছু জানবার উপায় ছিল না। মাঝে মাঝে দুর্গা এসে ঝুঁকে পড়তেন—"কি এত লিখছ গো?"

—"কই, কি আবার লিখছি?" তাড়াতাড়ি ডায়েরীর পাতাখানা বন্ধ করে দিতেন বরেন মুখুজ্যে।

—"না দেখালে তো রয়েই গেল"—দুর্গা রাগ করে চলে যেতেন। বরেন মুখুজ্যে একটু—হাসতেন তারপর আবার লিখতে সুরু করতেন—

মরণ দোলায় দুলিছে কে ঐ
তরুণ বীর।
সে বুঝি জাতির বিজয় নিশান
সে বুঝি তিলক জয়শ্রীর।
নিরক্ত সব ভায়েদের বুকে সে কি গো রক্তলিখা
ফাঁসি কাঠে তার হাসি হাসি মুখ
ঐ দ্যাখ তার উচ্চ শির।
ঐ দোলনায় যে দোলে আজিকে
দেশ জননীর অর্ঘ্য সে।
নব যুগে যত নবীনের কাছে
সে জীবন উৎসর্গ যে।
ওরে মনে করে আপন অনলে
হোলি খেল ওরে ভাই
ওর ধমনীতে যে রক্ত নাচে
তোদেরও শিরায় তেমনি রক্ত চাই
ফাঁসি কাঠে ওর সিংহ আসন
ও যে আজি রাজা বিদ্রোহীর।

এমনি সব কত গান কবিতা বরেন মুখুজ্যের ডায়েরীর পাতায় লেখা থাকত। কিন্তু তখন এ সব ছিল বরেন মুখুজ্যের অতি গোপন সম্পদ। সকলের চোখের আড়ালে তিনি তার এই গোপন সম্পদের পাতাগুলো তিল তিল করে ভরিয়ে তুলতেন।

চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহের জের চলছে তখনও। বাংলার যৌবন সেদিন কারা প্রাচীরের অন্তরালে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রায় সকলেই কারাগারে। বাংলার প্রাণশক্তি তখন স্তব্ধ, নিশ্চল।

বরেন মুখুজ্যের ডায়েরীর পাতায় আর একটি কবিতা স্থান পেল।

"এখন যার যা আছে ঘরে, আনরে থালা ভরে
আন আরতির প্রদীপ জ্বেলে, আনরে, বলির খড়্গ।
আজ নিতে হবে, দিতেও হবে, দেরি কেন করিস্ তবে
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মরতে হয় তো মরগে।"

লিখতে লিখতে ডায়েরীর পাতা ভরিয়ে ফেললেন বরেন মুখুজ্যে—আজ প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসি হয়ে গেল', কাল সারারাত ঘুমুতে পারিনি। বার বার মনে হয়েছে যেন ফাঁসি মঞ্চের ওপর হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়েছে দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞের শহীদগণ। সবাই হাত ধরাধরি করে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের উজ্জ্বল চোখে আনন্দ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বাংলার বিপ্লব যজ্ঞের শহীদ ক্ষুদিরাম হসিমুখে বলছে—"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী"। চট্টলের যৌবন প্রমোদ রঞ্জন, নদীয়ার কর্মবীর অনন্তহরি উল্লাসে উপেক্ষায় অট্টহাসি হেসে বলছে—"ওহে আজ শেষ রাতে আমাদের ফাঁসী হবে।" বন্দীদের প্রতি কক্ষ থেকে ধ্বনিত হচ্ছে—"বন্দে মাতরম্।" বন্দীরা মুক্তকণ্ঠে গেয়ে উঠছে—'মাতৃভূমির সন্তান বীর আবার অসিও ফিরে'। বধ্য ভূমির ওপরে দ্বিতল কক্ষে রাজবন্দীরা বীরপূজায় মগ্ন। ধূপধূনোর গন্ধ বধ্য ভূমিকে যজ্ঞ ভূমি করে তুলেছে। অসংখ্য চন্দন চর্চিত পুষ্পমালা পুষ্পাঞ্জলির মত স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের মস্তকে বর্ষিত হচ্ছে।"

ওদিকে সারা বাংলায় তথা সারা ভারতে তখন সাড়া পড়ে গেছে—সুভাষ-সুভাষ। লেফট রাইট—লেফট রাইট—রাইট লেফট্ করতে করতে তালে তালে এগিয়ে চলছে সুভাষের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'বেঙ্গল ভলানটিয়ারস্'।

"হে আমার তরুণদল, তোমরাই তো দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ তোমরাই তো চিরকাল 'জীবন মৃত্যুকে' পায়ের

'ভৃত্য' করে রেখেছ। ভয় তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করেনি। স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বীর সৈনিকের মত তোমরা হাসতে হাসতে মরণকে আলিঙ্গন করেছ। ওগো বাংলার যুব সম্প্রদায়, স্বদেশ সেবার পূণ্য-যজ্ঞে আমি তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা যেখানে যে অবস্থায় আছ ছুটে এস। চারি দিকে মায়ের মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠেছে।"

দলে দলে কাতারে কাতারে বাংলার তরুণ তরুণী সুভাষের বেঙ্গল ভলানটিয়ারস্ পার্টিতে এসে যোগ দিল।

সে একটা দিন গেছে। স্বাধীনতার যজ্ঞবেদীতে কে আগে জীবন আহুতি দেবে তারই জন্য যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। আর আজ? বাংলার তরুণদের নাম হয়েছে 'মস্তান'। সুর্পণার ঘরের জানালার সামনের পার্কটায় ওদের রোজই দেখা যায়। জানালার কাছে এসে দাঁড়ালে ওদের দু একটা কথাও কানে আসে। মাঝে মাঝে সুর্পণা ঘরের আলো নিবিয়ে জানলাটার কাছে চেয়ার খানায় বসে থাকে। তখনই ওদের ভাল করে দেখা যায়, ওদের কথা শোনা যায়। বিকেল থেকে রাত ১১টা সাড়ে এগারটা পর্যন্ত ওরা ওখানেই বসে থাকে। ওরা ঘরের ছেলে না বাইরের ছেলে, ওরা ছাত্র না বেকার কিছুই বুঝবার উপায় নেই। টেরিলিনের ডোরা কাটা কোমর পর্যন্ত ঝুলের হাওয়াই সার্ট অথবা টাইট গেঞ্জি, পায়ে উঁচু হিলের জুতো, বাবরি চুল আর মুখে সিগারেট। দিনের আলো থাকলে চোখে কাল চশমা। পেছন থেকে বুঝবার উপায় নেই ছেলে কি মেয়ে।

এরাই আজকের বাংলার তরুণ, এরাই আজ জাতির ভবিষ্যৎ। এদেরই মুখ চেয়ে ওদের অভিভাবকরা সকাল সন্ধ্যা পরিশ্রম করে ওদের নিত্য নূতন আবদারের খোরাক জোগাতে জোগাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। কোনদিন রাত একটু বেশী হ'লে ওরা করপোরেশনের রাস্তার আলো ফাটানোর খেলায় মেতে ওঠে।

—"মাইরি বালবগুলো খুব রোশনাই মারছে, নিউ আমদানী ঝেড়ে দি ওটাকে—"

—"দে—"

—"এক শটে ঝাড়ব; কি খাওয়াবি বল ?"

—"ছোট বিবি—"

—"আরে যাঃ, বড় কিছু খাওয়া—"

—"পকেট গড়ের মাঠ ব্রাদার, ওর বেশি হবে না—"

—"তুই তো রাজা রে ফটকে। তোর বাপ না কিসের একটা ব্যবসা করে —"

—"বাপটা এক নম্বরের কেপ্পন মাইরি। সুযোগ বুঝে না সরালে এক পয়সাও ঠেকায় না। এদিক দিয়ে আমার মাদার কিন্তু ভারী লিবারেল। ঐ লেডি না থাকলে কবে একদিন হয়ে যেত একহাত—"

—"খুব অয়েল মাব ফট্‌কে। অয়েলের ওপর ফেলে ঠেলে দে, গড়িয়ে যাবে—"

—"ওসবে কিস্সু হবে না ; ব্যাটা আমারই বাপ তো টাকা পয়সার কথা বললেই মুখের অন্যরকম চেহারা। ঘেন্না ধরে গেছে জীবনে। একদিন হাওড়া ব্রীজের ওপর থেকে জয় মা কালী বলে লাফিয়ে পড়বো---"

—"শ্লা মেজাজের বারোটা বাজিয়ে দিস্‌নি। তার চেয়ে আয় একটু নাচি। এই মদনা তুই সেই গানটা ধর—"

এবারে নাচ সুরু হবে বুঝে সুপর্ণা সরে আসে জানালার কাছ থেকে। এ নাচ ও সইতে পারে না। কেমন যেন গা গুলিয়ে ওঠে ওর।

প্রথম যখন ও চাকরী নিল তখন অফিসের আবহাওয়াও ওর কেমন অদ্ভুত লাগত। চায়ের কেটলি আর খাবারের ডেকচি নিয়ে যখন দীনবন্ধু সেক্‌সনে ঢুকত তখন সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ত। দীনবন্ধু অফিসেরই চাপরাশী কিন্তু আসলে সে এই চা আর টিফিনের

ব্যবসাই করে।

—"কি এনেছ হে দীনবন্ধু ?"

—"চপ, ঘুঘনি, আলুর দম, পরোটা"

—"দেখি দেখি, কিসের চপ, গরম আছে তো ?" ফাইল ঘাঁটা নোংরা হাত নিয়ে সবাই চপগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে।

"চাই রসগোল্লা পানতুয়া, সিঙ্গাড়া, নিমকী—"

"ওই মদনমোহনও এসে গেছে ; এস হে এস, দেখি তোমার মাল"—দাসবাবু হাত নেড়ে ডাকেন।

খাওয়া আর গল্প শেষ করতেই প্রায় বেলা তিনটে। দত্তবাবু সুপর্ণার দিকে ফিরে বলেন—"আপনি তো কিছু নিলেন না মিস্ মুখার্জি—"

"এ সময় আমি কিছু খাইনে—"

"তবেই হয়েছে। খাবার আবার সময় অসময় কি ? না খেলে খাটবেন কি করে ?"

"কি বা কাজ, তার আবার খাটুনি। আমার তো কাজ শেষ করতে একঘণ্টাও লাগে না।

হঠাৎ দত্তবাবু নীচু গলায় বলেন—একটা কথা বলে নিই মিস্ মুখার্জি। কাজ নেই এমন কথা কখনও কারও কাছে বলবেন না। কাজ লক্ষ্মী নেই বলতে নেই। সব সময় ফাইল টাইল টেবিলে ছড়িয়ে রাখবেন। সব সময় দেখাবেন আপনার অনেক কাজ। ঐ যে দাসবাবু সব সময় গলাবাজী করে বেড়াচ্ছেন, কাজ করতে করতে জান কয়লা হয়ে গেল সত্যিই কি ওর টেবিলে কোন কাজ আছে ?' অফিসে কখন আসে সেটাও তো দেখেছেন ওর ওই 'ভিক্টোরিয়ান' যুগের ব্যাগ হাত থেকে নামিয়েই তো চরাবরা করতে বেয়োয়। ওর তো কাজই হচ্ছে সবারই কাজে নাক গলানো আর সবাইকে অযাচিত উপদেশ দেওয়া"—হঠাৎ গলা নামালেন দত্তবাবু—"তাই বলছিলাম মিস্ মুখার্জি না খেলে অফিসে কাজ করবেন কি করে ?"

এটা ওটা নাড়াচাড়া করছে আর সবারই চোখের ওপর একবার করে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করছে। দাসবাবুকে সবাই এড়িয়ে চলে, ভয়ও করে, দত্তবাবুও করেন। আড়ালে সবাই ওকে টিকটিকি বলে। সাফাই গাইবার সুরে তিনি বললেন "এই যে দাসবাবু আপনার কথাই বলছিলাম এতক্ষণ মিস্ মুখার্জিকে। পাবলিক ওয়ার্ক কাকে বলে একবার দেখুন দাসবাবুর দিকে চেয়ে। এমন কাজ নেই যা উনি জানেন না। উনি একাই সবারই টেবিল সামলাতে পারেন।"

—"তা এই সাতসকালে আমায় নিয়ে না পড়ে নিজের কাজ করলেই তো পারেন দত্তবাবু। মিস্ মুখার্জি তো আর অন্ধ নন যে কিছু দেখতে পান না।"

তা এসব তো সেই চাকরীর প্রথম আমলের কথা। তখন পদে পদে ওর ভুল হত। একবার নিজের নোটের ডান পাশে সই করে অফিস শুদ্ধ সবাইকে ও হাসিয়েছিল। "মাল-মাল-পয়মাল সব"—

—"অফিসার হবার শখ হয়েছিল তাই ডানদিকে সই করেছেন। আমরাও কাল থেকে করব — কি বলেন ?"

সুপর্ণা একদিন অফিসের অফিসার-ইন চার্জকে 'মিষ্টার' বলায় সবাই আকাশ থেকে পড়েছিল। "চাকরীটা খোয়াবেন মিস্ মুখার্জি—"

—"কেন কি করেছি আমি ?"

—"গেজেটেড অফিসারদের কখনো মিষ্টার বলে ?"

—"কেন ? গেজেটেড অফিসারদের তাহলে কি বলতে হয় ?"

—"সাহেব সাহেব। গজে চাপলেই সাহেব। শ্রীনিবাসন সাহেব, মক্ষিজানী সাহেব, ব্যানার্জি সাহেব"

"বেশ, এখন থেকে তা হলে তাই বলবো"

এই শ্রীনিবাসন সাহেবই একদিন ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ভয় পেয়ে গিয়েছিল সুপর্ণা। দাশগুপ্ত সাহেব সুপর্ণার ওপর তেমন

সুপর্ণা আর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দাসবাবু তার সিটে ফিরে এসে

প্রসন্ন ছিলেন না, বললেন—"যান, এখন সাহেবকে গিয়ে কি বোঝাবেন, বোঝানগে—"

"কেন কি হয়েছে ?"

"হতে আর বাকীটা কি আছে বলুন। ঝট্ করে নিজের ফাইলটা সোজা সাহেবের কাছে পাঠালেন, আমায় একটু দেখিয়ে পর্য্যন্ত নিলেন না। ঠ্যালা সামলান এখন—"

সুপর্ণা সেদিন তুরু তুরু পায়ে ফাঁসীব আসামীব মত শ্রীনিবাসন সাহেবের বিরাট ঘরজোড়া টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সাহেব চুরুট খাচ্ছিলেন, বললেন—কিন্তু কি বললেন এক বর্ণও বুঝতে পারলো না সুপর্ণা। ভয়ে লজ্জায় ওর মুখ লাল হয়ে উঠলো। ওর অবস্থা বুঝে শেষ পর্য্যন্ত শ্রীনিবাসন সাহেব তুদিকে ঘাড় নেড়ে ওকে চলে যেতে বললেন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সুপর্ণা। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ওর। কথাটা অবশ্য চাপা রইল না। চাপা গুঞ্জন সুপর্ণার কানেও আসতে লাগল। এতদিন পরেও সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে সুপর্ণার। সেদিন ওর মনে হয়েছিল সংসারের সব অগৌরবের বোঝা কেউ যেন ওব মাথার ওপর ঢেলে দিয়েছে !

পাঁচ

১৯৩১ সালের ৬ই জুলাই। বড় ক্লান্ত বড় অবসন্ন হয়ে বাড়ী ফিরলেন বরেন মুখুজ্যে। স্নান খাওয়া না করেই গিয়ে শুয়ে পড়লেন। জগত্তারিণী দেবী ছুটে এলেন খবর পেয়ে।

"বরেন ! কি হয়েছে বাবা, জ্বর হয়েছে ? দেখি গা টা ?"

"জ্বর হয়নি মা এমনই ভাল লাগছে না। চুপ করে একটু ঘুমুলেই ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা আমার জন্যে বসে থেকো না, খেয়ে নাও গে—"

ছেলের কাছে তবু কিছুক্ষণ বসে রইলেন জগত্তারিনী দেবী, মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

সংসারের কাজ শেষ হলে শ্বেত পাথরের গ্লাসে একগ্লাস গরম দুধ নিয়ে ঘরে এলেন দুর্গা। জানালাগুলো ভেজিয়ে দিয়ে দুধের গ্লাস নিয়ে বরেন মুখুজ্যের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন! পেছন ফিরে শুয়ে আছেন বরেন মুখুজ্যে।

—"দুধ টুকু খেয়ে নাও—শুনছ—ওগো—"

বরেন মুখুজ্যে তেমনই শুয়ে রইলেন। সাড়াও দিলেন না, পাশও ফিরলেন না। দুধের গ্লাস ঢাকা দিয়ে রেখে বিছানায় উঠে এলেন দুর্গা। পাশ কাটিয়ে দেওয়ালের ধারে গিয়ে বসলেন। কিন্তু একি! বিস্ময়ে দুশ্চিন্তায় বলে উঠলেন দুর্গা—

—"একি তুমি কাঁদছ! কি হয়েছে তোমার?"

বরেন মুখুজ্যে খালি কাঁদছেন আর চোখ মুছতে মুছতে বলছেন—"কোথায় কাঁদছি? কাঁদছি আবার কোথায়?"

—"আমার যে বড্ড ভয় করছে গো—আমি মাকে ডেকে আনি—"

—"না-না মাকে ডেকো না"—দুর্গার হাতখানা ধরে ফেলেন বরেন মুখুজ্যে। দুর্গার চোখ দিয়েও তখন জল পড়তে সুরু করেছে। কিছু না জেনেই কাঁদছেন তিনি। বরেন মুখুজ্যে বললেন—"ছিঃ তুমি আবার কাঁদছ কেন?"

—"তুমি কেন কাঁদছ তা বলবে তো। আমার যে বড্ড ভয় করছে। আমার যে কষ্ট হচ্ছে—"

—"না-না তুমি কেঁদ না। আমি এমনই কাঁদছি।"

—"এমনি কাঁদে কেউ? হ্যাগো, বেটা ছেলে কি অমনি কাঁদে?"

—"না-না আমায় কিছু জিজ্ঞাসা কর না আমি কিছু বলতে পারব না—"

—"বেশ বলো না তবে, কিন্তু আর কেঁদ না তুমি। দুধটুকু

খেয়ে নাও। উঠে নেয়ে ভাত খাও তোমার জন্যে আমি সব তুলে রেখেছি—"

—"এ বেলায় কিচ্ছু খাব না। "আর তো কিছু করতে পারব না—একটু উপোষ করেই ওকে শেষ সম্মান জানাই।

—"কার কথা বলছো গো? কার কথা বলছ তুমি?"

—"সে নাম বললে আমার চাকরী যাবে তোমরা না খেয়ে মরবে।"

—"মরি তো মরব—তুমি বল।"

—"তার নাম দীনেশ।"

—"দীনেশ! কোন দীনেশ গো, আমাদের গাঁয়ের সেই চক্রবর্ত্তী দের দীনেশ?"

—"আরে না-না-এ আমাদের দীনেশ, স্বদেশী ছেলে দীনেশ।"

—"ও মা তাই বল? তা সে তো আমি সকালেই শুনেছি। আহা অমন সোনার ছেলের আজ ফাঁসী হয়ে গেল।"

বরেন মুখুজ্যে তখন উঠে বসেছেন।

—"তুমি এত খবর কোথায় পেলে?"

—"ও মা শোন কথা, আমাদের গৌরী আর শংকর তো দিনরাত ঐ নিয়েই আছে। সত্য পণ্ডিতের ছেলের কাছ থেকেই শংকর সব খবর নিয়ে আসে। তা হলে দীনেশের জন্যেই তুমি উপোষ করে পড়ে পড়ে কাঁদছ। তুমি খাওনি বলে আমিও খাইনি। একদিন না খেলে কি আর হবে? দীনেশের জন্য আমরা দুজনেই আজ উপোষ করি, কেমন?"

এদিকে জগত্তারিণী দেবীর দুপাশে দুই ভাই বোন শুয়ে শুয়ে তখন বলছিল "জান ঠাক্‌মা! আমরাও বড় হয়ে সাহেব মারব আর দীনেশদার মত ফাঁসী যাব।"

জগত্তারিণী দেবী আঁতকে ওঠেন।

—"ছিঃ শংকর অমন কথা বলতে নেই কেউ শুনতে পেলে

তোমার বাবার চাকরীটা যাবে। বাড়ী শুদ্ধ সবাইকে নিয়ে গিয়ে জলে পুরবে।"

—"তা হলে কিন্তু বেশ হয় ঠাক্‌মা, ভাস্করদাকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। মজা করে সবাই মিলে জেলে থাকা যাবে।" হি হি করে হাসে শংকর।

—"ঐ সত্য মাষ্টারের বেটাই দেখছি তোদের মাথাটা খেলে। এবারে ওকে দেখতে পেলে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব। স্বদেশী করছিস্‌ তুই কর, এসব দুধের ছেলেমেয়েদের তার মধ্যে টানা কেন?"

গৌরী মিটিমিটি হাসছিল, বলল "ঠাক্‌মা তোমাকে আমরা মেদিনীপুরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসব—"

—"কেন? সেখানে আবার কি?"

—"ও মা সেখানেই তো সব। দীনেশদাও তো ঐ মেদিনীপুরেরই ছেলে—"

—"তোরা দেখছি তোদের বাবার চাকরীটা আর রাখতে দিবিনে, চাকরী গেলে খাবি কি?"

—"খাব না, উপোষ করব।"

গোপনতা আর বিপদ চিরদিনই দুঃসাহসী যৌবনকে আকর্ষণ করে। জগতের ইতিহাসে হিংসানীতির পরীক্ষা বহুবার হয়ে গেছে। বর্ত্তমানেও এটা সমান প্রবল। সম্ভবতঃ আরও দীর্ঘকাল এইরকমই থাকবে। হিংসা আর বলপ্রয়োগের দ্বারাই অতীতে বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। ডবলু,ই গ্লাডষ্টোন একদিন বলেছিলেন "আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, রাজনৈতিক সংকটের সময় যদি দেশের জনসাধারণকে বলা হয় হিংসাকে ঘৃণা কর, শৃঙ্খলাকে মেনে চল, ধৈর্য্যকে অবলম্বন কর তাহলে সে দেশ কোনও দিন স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে না।"

ইতিহাসের পাতা উলটে চলেছে। অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসন

তন্ত্রের একটি একটি করে অধ্যায় শেষ হচ্ছে। একদিকে আঘাত আর একদিকে প্রতিশোধ—অত্যন্ত সোজা হিসেব জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিলেন উধম সিং বিলেতের মাটিতে দাঁড়িয়েই তিনি জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের নায়ক ও ডায়ারকে হত্যা করলেন। মেদিনীপুরের দীনেশ গুপ্তের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হল একটার পর একটা শাসকের তাজা রক্ত দিয়ে। একে একে পেডি, ডগলাস এবং বার্জকে রক্ত দিয়ে তাদের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল।

ক্ষিপ্ত হিংস্র নেকড়ের মত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার। সেদিনের পৈশাচিক অত্যাচারের কথা মনে হলে ঘৃণায় লজ্জায়, অপমানে সারা শরীর শিউরে ওঠে। পুরুষদের চাবুক মেরে রক্তাক্ত করা, মেয়েদের উলঙ্গ করে গায়ে থু থু দেওয়া। যখন তখন জেলে ঢুকে বেপরোয়া লাঠি মারা, বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে মেয়েদের ক্রমাগত চড় মেরে জখম করা, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে মেয়েদের বিবস্ত্র করে দেহের অভ্যন্তরে লঙ্কাবাঁটা ঢুকিয়ে দেওয়া এইসব ছিল সুসভ্য ইংরেজের অত্যাচারের নমুনা।

১৯২৮ থেকে ১৯৩৯—সেই একই কথা, একই দাবী। সংগ্রাম চাই। চাই একটানা আপোষহীন সংগ্রাম। স্বাধীনতার এই মরণপণ যুদ্ধে জাতি তখন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। হিংস আর অহিংস। কিন্তু লক্ষ্য ওদের এক। বিদেশী শত্রুর কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করা। বিদেশী প্রভুদের হিংস্রতার চেহারাও এক, অত্যাচারের পদ্ধতিও এক। দৈহিক শক্তির ক্ষেত্রে চিরদিন হেয়, অবহেলিত বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে সেদিন এক দুর্জয় শক্তি আর অমিত তেজ দেখে সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তখন জাপানীরা ধীরে ধীরে ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে। ব্রিটিশ রাজ তখন ক্ষিপ্ত উন্মত্ত। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ব্রিটিশ সংবাদ পত্রের মাধ্যমে ভারতের জাতীয়

ান্দোলনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদ্গার করছেন। জনসাধারণের ীবন তখন অতিষ্ঠ, দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে ব্রিটিশের অত্যাচারে ্ভাষের অন্তর্ধানে দেশব্যাপী একটা তুমুল আলোড়ন উঠেছে।

—"বল সুভাষ কোথায়? বল সে কোথায় পালিয়েছে? বল স কেমন করে পালাল"—সবাই মূক, বধির। একটা কাল মেঘে ভারতের আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। জনগণ তখন রুদ্ধশ্বাসে ংগ্রেসের নির্দেশের প্রতীক্ষায়। সারা ভারত চেয়ে আছে মহাত্মা াম্ধীর মুখের দিকে, জহরলাল নেহেরুর মুখের দিকে, বল্লভভাই াটেলের মুখের দিকে।

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট বোম্বে অধিবেশনে এ, আই, সি, সি ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করল। কংগ্রেসের ভারত ছাড় প্রস্তাব ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে চুয়াত্তর বৎসরের প্রবীণ গান্ধীজীকে এবং মস্ত কংগ্রেস নেতাদের বন্দী করা হল কারা প্রাচীরের অন্তরালে। ব্রিটিশ সরকার তখন তাদের চণ্ডনীতির চরম প্রয়োগ করে চলেছে। ংগ্রেসকে বেআইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হল। পুলিশ এবং ালিটারীর হাতে দমন নীতির সব রকম ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হল। েখানে এতটুকু বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা দেবে সেখানেই তাকে সমূলে ্বংস করার নির্দেশ দিল ব্রিটিশ সরকার।

সমস্ত পৃথিবী তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' ্রস্তাব শুনে। এ বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ দমন করতেই হবে নির্মম াতে। নেটিভদের দুঃসাহসের জবাব দিতে হবে বেয়নটের মুখে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছে। ভারত তো শুধু কংগ্রেসের নয় সেখানে নাইনটি মিলিয়ন মুসলমান আছে, ফিফটি মিলিয়ন ডিপ্রেসড ক্লাস আছে, নেটিভ ষ্টেটে নাইনটি ফাইভ মিলিয়ন প্রজা আছে, জিন্না আছে, ফজলুল হক্ আছে ্বনাটা কিসের? ডিভাইড্ এ্যাণ্ড রুল'—চার্চিল সাহেবের মুখে ্ট হাতে ভি মুদ্রা।

ছয়

ভাস্কর তখন কলকাতায় আর্ট স্কুলে পড়ে। একটি ছেলেকে পড়ায় আর তাদেরই বাড়ীর বাইরের ঘরটিতে থাকে। ভদ্রমহিলার স্বামী থাকতেন বার্ম্মায়। ছেলে পড়ান বাদেও ওদের বাজার করে দিতে হয়, ফাইফরমাস খাটতে হয়। ওখানেই দুবেলা খাওয়াটাও জুটে যায় ভাস্করের। ফার্ষ্ট বয় বলে আর্ট স্কুলেও ও কে মাইনে দিতে হয় না। ওর বাবা সত্য চ্যাটার্জি পাবনা জেলা স্কুলের সংস্কৃতের পণ্ডিত স্ত্রী আর একটি মেয়ে নিয়ে তিনি পাবনাতেই থাকেন। নিজের পড়াশোনা কলকাতায় থাকার খরচ সবই নিজেকে চালাতে হয় ভাস্কর কে।

বরেন মুখুজ্যেও তখন কলকাতায়। তার চাকরীর আরও উন্নতি হয়েছে। শংকর প্রায়ই আর্ট স্কুলে গিয়ে ভাস্করের সঙ্গে দেখা করে আসে। ভাস্করের সেবার ফাইনাল ইয়ার। এক্‌জিবিসনে ওর কতগুলো ছবি খুব নাম করেছে। অয়েল পেন্টিং এ ওর সুন্দর কাজের জন্যে প্রায়ই ওর কাছে নানারকম অর্ডার আসে কিন্তু ছবি আঁকার সময় ওর খুবই কম। নানারকম কাজ নিয়ে ওকে ব্যস্ত থাকতে হয়। গৌরীর সঙ্গে ওর প্রায়ই কার্জন পার্কে দেখা হয়।

সেদিন রাত বোধহয় প্রায় বারটা বাজে। ওপর থেকে ভদ্রমহিলার ডাক শুনে ধড়মড় করে ঘুম চোখে উঠে বসল ভাস্কর। ওপরে উঠে আসতেই সিঁড়ির মুখে এগিয়ে এলেন ভদ্রমহিলা।

—"ভাস্কর! দেখ তো মোড়ের হোটেলে কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা। বেশী দেরী করো না যেন।" টাকা হাতে ভাস্কর বেরিয়ে যায়। প্রায় সব খাবারের দোকান, হোটেলই বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুটা দূর এগিয়ে একটা মিষ্টির দোকান থেকে কিছু

ঠাণ্ডা লুচি, ছোলার ডাল আর মিষ্টি নিয়ে ফিরে এল ভাস্কর। ভদ্রমহিলা তখনও সিড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। ওর হাত থেকে খাবারের ঠোঙ্গাটা নিয়ে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি। ভাস্কর নীচে নেমে এসে আবার শুয়ে পড়ল।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেও ভাস্করের রাতের কথাই মনে হল। কই সকালে তো কাউকে দেখতে পেল না ও। প্রতিদিনের নিয়মেই সকাল থেকে সংসারের চাকা ঘুরতে লাগল। ঝি এল রাঁধুনী এল, অশোক বইখাতা নিয়ে পড়তে এল, বাজারের থলে নিয়ে বাজার করে আনল ভাস্কর। দু চার দিনের মধ্যেই সেদিনের ঘটনাটা ও ভুলে গেল।

সেদিন পার্টির অফিসে গিয়েই ভাস্কর শুনতে পেল কে একজন ডাক্তার হালদার এসেছেন বার্মা থেকে সুভাষের বাণী নিয়ে। ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে তার সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সময়—বেলা প্রায় তিনটে। চারটের পর থেকেই চা পিপাসুদের ভীড় লাগে!

ডাঃ হালদারকে ঘরে ঢুকতে দেখেই চমকে উঠল ভাস্কর।

—"চন্দ্র দা। আপনি"—

"আরে ভাস্কর যে, তুমি এখানেও এসে জুটেছ। বেশ বেশ দেখে খুবই খুসী হলাম। তারপর কাজকর্ম কেমন চলছে বল।"

পদ্মাপারের হিমায়েতপুর গ্রামের সেই সন্ত্রাসবাদী দেশ নেতা চন্দ্রনাথ দে। চট্টগ্রাম আন্দোলনেব নিরলস কর্মী চন্দ্র দা। সবাই ভেবেছিল চন্দ্র দা শহীদ হয়েছেন। আজ এতদিন পরে সেই চন্দ্রদা ডাক্তার হালদার হয়ে ফিরে এসেছেন বাংলাদেশে।

এটা নামে চায়ের দোকান হলেও আসলে এটা পার্টির একটি গোপন আস্তানা। চন্দ্রদা-ই আবার বললেন—

"শেষ পর্যন্ত দেশ থেকে পালাতেই হল। বার্মাতেই আছি

এখন। ওখানেই একটা ওষুধের দোকান দিয়েছি। বিক্রী ভালই হয়। চলেও যাচ্ছে ভালভাবে। নেতাজীর ১৯শে ফেব্রুয়ারীর মেসেজ শুনেছিস্ তো তোরা ?"

কে না শুনেছে সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বর "আমি এতদিন অলক্ষ্য থেকে ধৈর্য ধরে সব কিছু লক্ষ্য করে এসেছি। এবারে আঘাত করবার সময় হয়েছে তাই আমি এখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। শত্রুকে ধ্বংস করতে যারা আমাদের সাহায্য করবে, তাদের সঙ্গেই আমরা সহযোগিতা করব।

চন্দ্রদার পরণে একেবারে খাঁটি সাহেবী পোষাক। ফর্সা টকটকে রং। মাথায় হ্যাট। ভারতীয় বলে হঠাৎ চিনবার উপায় নেই। ভাস্কর চন্দ্রদার মুখের দিকেই চেয়েছিল, তিনি তখন বলছিলেন— "অনেকের কাছেই গেলুম এ কয়দিন কিন্তু কিছুই হল না। সবাই উদ্গ্রীব হয়ে চেয়ে আছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চন্দ্রদা আবার বললেন যারা আমাদের দলে ছিল তারা প্রায় অনেকেই বিট্রে করেছে।"

"ব্রিট্রে করেছে। কাকে ?"

"কাকে আবার, দেশকে। অনেকে আবার ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মেলাবার তালে আছে।"

"কই তেমন তো কিছু বুঝতে পারছিনে"

"তার মানে তোরাও ঐ রকমই কাজ করছিস্! হঠাৎ কেমন যেন বিরক্ত হয়ে ওঠেলেন চন্দ্রদা, আপন মনেই বলতে লাগলেন যখন দেশের বাইরে ছিলাম তখন মনে হোত দেশে খুব কাজ হচ্ছে। এমন সুযোগ আর কি কোন দিন আসবে ? ভিক্ষে করে কি কোনদিন স্বাধীনতা পাওয়া যায় ?"

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ওদের নানারকম আলোচনা হল। দোকান বন্ধ হবার সময় হতেই চন্দ্রদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে যার নিজের পথ ধরল। ভাস্করও চলে যাচ্ছিল, চন্দ্রদা ডাকলেন "তুই

কোনদিকে যাবি ?"

"শ্যামবাজারে"

আমিও ঐদিকেই চল একসঙ্গেই যাই। পেছনে পুলিশ লেগেছে আর বেশীদিন এখানে থাকা যাবে না। তা ছাড়া শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে কাজ হচ্ছে না কিছু। এ সুযোগ সবাই হেলায় হারাল দেখে আরও কষ্ট হচ্ছে।"

শ্যামবাজারের মোড়ে ওরা বাস থেকে নামল।

"চল ভাস্কর ঐ মোড়ের দোকানটা থেকে কিছু খেয়ে নি। এত রাতে ওকে আর বিব্রত করব না। তুই কোন গলিতে যাবি ?"

গলির নাম বলতেই চন্দ্রনাথ হেসে উঠলেন "তবে তো একই রাস্তা আমাদের।" দুজনে এসে একই দরজায় দাঁড়াল। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাইল, তারপর ভাস্কর হেসে ফেলল। চন্দ্রনাথও হাসলেন।

—"ভালই হোল ভাস্কর! তোমায় আর খাবার আনতে ছুটতে হবে না। ঐ লালকে নিয়েই আমি একটু ঝামেলায় পড়েছি। ও আর এখানে থাকতে চায় না। অশোককে কি ওর মামার বাড়ীতে রেখে এসেছ ?"

—"হ্যাঁ।"

—"কই ভেতরে এস। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবে না কি ? ভাস্করকে তুমি চেন মনে হচ্ছে।"

চন্দ্রনাথ হা হা করে হেসে উঠলেন। "আয় ভাস্কর! তোদের পরিচয়টা করিয়ে দি। ইনি আমার সহধর্ম্মিনী লীলাবতী ওরফে লালবাঈ। না না তোমায় ব্যস্ত হোতে হবে না আমি খেয়ে এসেছি।"

ঘরে এসে টেবিলের পাশে রাখা চেয়ারে বসল দুজনে।

"আর কিছু না খাও দুজনে দুকাপ কফি খাও। ফ্লাস্কে ভরে রেখেছি।"

"গুড" লালদির পিঠ চাপড়ে দিলেন চন্দ্রদা।

লালদি তটস্থ হয়ে উঠলেন—"আঃ, আস্তে কথা বল।" তুমি কি সর্বনাশ করতে চাও? লালদি চলে গেলেন পাশের ঘরে। চন্দ্রদাও গলা নামালেন।

—"ওর লালবাঈ নাম আমারই দেওয়া। মহাভারতের কোন নারী চরিত্রের সঙ্গে যদি লীলার তুলনা করতে হয় তাহলে সে নাম নিঃসন্দেহে চিত্রাঙ্গদা, মণিপুরের রাজার মেয়ে। যিনি সর্বদা নিজেকে পুরুষের সমকক্ষ বলে মনে করতেন এবং সেইভাবেই চলতেন। আমি তখন চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের সঙ্গে বেশ ভালভাবেই জড়িয়ে পড়েছি! প্রীতি ওয়াদ্দার তখন দেশের জন্যে মৃত্যুকে বরণ করেছেন। শান্তি, সুনীতির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে। মাষ্টারদা অজ্ঞাতবাস করছেন। সেই যুগ সন্ধিক্ষণে একদিন ঝড়ের মত লীলা এসে দাঁড়াল আমার সামনে। কোন ভূমিকা নেই, কোন প্রস্তুতি নেই, সঙ্কোচ নেই, দ্বিধা নেই! লম্বা চুলের একটা রুক্ষ বেণী ওর গলার পাশ দিয়ে বুকের কাছে ঝুলছে সাপের মত। ওর মুখ উত্তেজনায় লাল টকটকে হয়ে উঠেছে, বলল—"আমিও আপনাদের সাঙ্গে কাজ করতে চাই। মেয়েবলে বিদায় করে দেবেন তা চলবে না। 'আমিও আপনাদের চেয়ে কোন দিক দিয়ে কম নই। রিভলবার বন্দুক ছুড়তে পারি। হাতের টিপ যাচাই করে নিতে পারেন, যুযুৎসু জানি, লাঠি-ছোরা খেলতে পারি, সাঁতার জানি, নৌকো চালাতে পারি, আমার হাতের এই মাস্‌ল দেখুন। দৈহিক শক্তিতেও আপনাদের চেয়ে আমি কোন অংশে কম নই। আমি কাল কেউটের মত ছুটতে পারি বলুন আর কি কি জানার প্রয়োজন আছে আমার?"

বিস্ময়ে থ হয়ে বসেছিলাম আমি। কিছু বলবার আগেই ও আবার বলল "চুপ করে থাকলেও শুনব না আমি। আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করবই।"

"এমনি করেই সুরু হয়েছিল একদিন। আমাদের স্বামী স্ত্রী

সেজে এ্যাবসকণ্ড করে থাকতে হয়েছিল অনেকদিন সেই সময়েই বিয়েটা সেরে ফেলি। তারপর কত দীর্ঘ পথ আমরা চলেছি। কখনও একসঙ্গে, কখনও একা। ওকে দেখলেই আমার রবি ঠাকুরের সেই কবিতাটি মনে পড়ে যায়'

'দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী
পূজা করি রাখিবে মাথায় সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি ' যদি পার্শে রাখ
মোরে, সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তায়
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।'

কফির পেয়ালা হাতে লালদি ঘরে এলেন। হাসিমুখে বললেন "কি গো? রাত দুপুরে তোমায় আবার কবিতায় পেল নাকি! ছেলেটাকে এবারে ছেড়ে দাও তো, ও বেচারা হাই তুলছে তোমার কবিতা শুনে। তারপর শোন, অশোককে শেষ পর্যন্ত আমি দাদার কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছি, টাকা পয়সার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি। তা হ্যাঁ গো তুমি কালই রওনা হচ্ছ তো? আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।"

একটা হালকা মন নিয়েই সেদিন ভাস্কর এসে নিজের ঘরে শুয়ে পড়েছিল আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ইতিহাসের সে এক কুটিল সন্ধিক্ষণ। হিন্দুস্থানের একদল মানুষ তখন নিজেদের স্বার্থচিন্তায় মগ্ন অন্যদিকে ভারতের অবশিষ্ট মানুষ মুক্তি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। তখন মহাযুদ্ধে ব্রিটিশের অবস্থা টলমল করছে। প্রথমে হংকং তারপর মালয় সর্বশেষে সিঙ্গাপুর। একে একে সব কিছু চলে গেল জাপানীদের অধিকারে। ভারতের

অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সরকার তখন হিংস্র মরিয়া হয়ে আবাল-বৃদ্ধ বণিতার ওপর তাদের চণ্ডনীতি প্রয়োগ করছে।

—"ভাস্কর! ভাস্কর" লালদি ঘুমন্ত ভাস্করকে একরকম টানতে টানতেই ওপরে নিয়ে গেলেন। ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে ওর হাতে কি একটা গুঁজে দিলেন। বড় শান্তিতেই সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছিল ভাস্কর। স্বপ্ন দেখছিল ভারত স্বাধীন হয়ে গেছে সবাই এসে দাঁড়িয়েছে জাতীয় পতাকার নীচে, সবাই মিলে গাইছে জাতীয় সঙ্গীত "বন্দেমাতরম্"

লালদি উত্তেজিত চাপা গলায় বললেন "পুলিশ বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। তোমার চন্দ্রদাকে যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে। পাববে না ভাস্কর?"

ভাস্কর ভাল করেই জানে চট্টগ্রাম আন্দোলনের ফেরারী আসামী চন্দ্রনাথ দে। ধরা পড়লে তার ফাঁসী হবে। লালদির ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে ভাস্কর বলল—'এটা লোড করা আছে তো লালদি?'

সাত

বাংলার বিপ্লব-যজ্ঞে যাঁরা জীবন আহুতি দিয়েছেন তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা কি সম্ভব? তাদেব ক জনের নাম জানি আমরা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলার অগুনন্তি মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ আজ অপাংক্তেয় ফসিল মাত্র।

পরবর্ত্তী জীবনে ভাস্কর গৌরীকে বলত "এই কি আমরা চেয়েছিলাম গৌরী? আজকের এই স্বাধীন ভারতই কি আমরা চেয়েছিলাম! এত দিয়ে এই কি আমরা পেলাম!"

—"তুমি চুপ কর লক্ষ্মীটি, বেশী কথা বললে তোমার শরীর আবার খারাপ হবে।"

"চুপ করব! কিন্তু আমি যে আর চুপ করে থাকতে পারছি

নে গৌরী। যার বাবাকে একদিন তিল তিল করে অনাহার অত্যাচারে মরতে হয়েছে, যার মাকে আত্মহত্যা করে মুক্তি নিতে হয়েছে, যার বোনকে—"ভাস্কর আর বলতে পারে না, মুখটা বালিশে গুঁজে দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। গৌরী নীরবে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ওর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ভাস্করের মাথার ওপর ঝরে পড়ে। অনেকক্ষণ পর ভাস্কর শান্ত হয়। গৌরী রুমাল দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে জলের গ্লাসটা ওর মুখের কাছে ধরে বলে --'জলটুকু খেয়ে নাও'।

আজ এতদিন পরে অতীতের প্রতিটি পরিচিত মুখ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মনে পড়ছে ভাস্করের ছোট বোন মমতাকে। সাত আট বছরের ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে। আঁটসাট করে পরা লাল ডুরে সাড়ী পরণে। টান টান করে বাঁধা এলো খোঁপায় একগোছা মৌরী ফুল। গোলাপী টোপা টোপা গাল, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে হয়, ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায় পাড়ার ছেলে সুপ্রিয়র সঙ্গে। কখনও জলে নেমে গামছা দিয়ে ছোট ছোট মাছ ছেঁকে তুলছে। কখনও বেত বনে ঢুকে কোঁচড় ভরে বেত ফল পেড়ে এনে ঝাল নুন দিয়ে দুজনে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে আর চোখ মুখ কুঁচকে সুপ্রিয়র দিকে চাইছে।

—"আমায় আর একটু দে।"

—"ইস্! খায় না মদন ঘুরে বেড়ায়! আমি বলে কাঁটার খোঁচা খেয়ে বেত ফলগুলো পেড়ে আনলাম। ঘর থেকে নুন লঙ্কা চুরি করে এনে জারিয়ে নিলাম! একটু যে দিয়েছি তাই ভাগ্যি, বেশী লোভ ভাল নয়, বুঝলি?" মমতা পা নাচিয়ে নাচিয়ে খাচ্ছে আর আড়চোখে চাইছে সুপ্রিয়র দিকে।

সুপ্রিয় রেগে গিয়ে উঠে দাঁড়ায় "আমি বাড়ী যাচ্ছি। ওবেলায় নীলুদের সঙ্গে জসিম মিঞার আমড়া গাছে আমড়া পাড়তে যাবো।"

"ও বাব্বাঃ ছেলের আবার রাগ দেখ না। এই নে রাক্ষস

কোথাকার”—“ভারী তো দিয়েছিস্ তার আবার কথা। তুই তো রাক্ষুসীর মত গবগব করে এতখানি খেলি।”

“বেশ করেছি খেয়েছি আমার জিনিষ আমি খেয়েছি তোরতাতে কিরে।”

ওদের কথায় কথায় ঝগড়া, কথায় কথায় ভাব।

সত্য মাষ্টার সন্ধে বেলায় ছেলে মেয়ে নিয়ে পড়াতে বসেন। পড়তে বসেই মমতা ঘুমে ঢোলে। ওর মা বলেন “ঘুমের আর দোষ কি বাবা! সারাটা দিন বন বাদাড়ে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভট্‌চাযদের সুপ্রিয়র সঙ্গে। আজ বেলা বারটার সময় কচু পাতায় জড়িয়ে এতগুলো পুটিমাছ এনে হাজির। কি না সকাল থেকে পানা পুকুরে ছিপ ফেলে বসে বসে ওগুলো ধরা হয়েছে। এ মদ্দানী মেয়ে নিয়ে কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে। ছেলে মেয়েকে আদর দিয়ে দিয়ে তুমিই মাথাটা খাচ্ছ।’

“বারে ছেলে আবার কি করল?” নাকিসুরে প্রতিবাদ জানায় ভাস্কর।

“আহা রে! কি লক্ষ্মী ছেলে তুমি আমার। দারোগাবাবুর কচি ছেলেটার সঙ্গে তো দিনরাত ঘুর ঘুর করছ।”

“তা ওরা একটু খেলা ধুলো করবে না দিনরাত ঘরে বসে থাকবে!”

“খেলাধুলো না ছাই ওই ছেলের জন্যে একদিন তোমার হাতে দড়ি পড়বে তা আমি বলে রাখলাম। চন্দ্র দে দিনের মধ্যে হাজারবার ওকে ডেকে পাঠাচ্ছে। পাড়ার লোকে বলে চন্দ্র দের বোমা তৈরীর কারখানা আছে মাটির তলায়। চাটগাঁর দলের সঙ্গে ওরও নাকি যোগ সাজস্ আছে।”

“কি আজে বাজে কথা বলছ? কেউ কোথাও শুনতে পাবে তখন সব শুদ্ধ ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরবে।”

ভাস্কর তখন ম্যাট্রিক পাশ করে পাবনা কালজে আই, এ

পড়ছে। সুপ্রিয় ম্যাট্রিক দিয়েছে। পুলিশ ব্যারাকের বড় খেলার মাঠে দুর্গাপূজার সময় যাত্রার আয়োজন। যাত্রা দলের গরুর গাড়ী এসে পৌঁছুবার পর থেকেই আনন্দে আর রোমাঞ্চে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের উৎকণ্ঠ প্রহর কাটছে। ওরা ছটফট করছে একটু আধটু উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখে আসবার জন্যে কিন্তু বাড়ীর কড়া নিষেধ। সেজে গুজে সেই সন্ধ্যেবেলায় মা বাবার সঙ্গে যেতে হবে। যখন হারমোনিয়ামে পোঁ ধরবে, বেহালায় পড়বে ছড়ের টান, এক আধটা সুর বেজে উঠবে বেহালায় তারপর সুরু হবে অভিনয় চারদিক খোলা আসবে। রাজা রাণী আসবে, তলোয়ার ঝনঝনিয়ে সেনাপতি আসবে, সখীরা এসে ঝলমলে পোষাক পরে ঘুরে ঘুরে নাচবে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা আর পাগড়ী মাথায় বিবেক এসে আঙ্গুল উচিয়ে গান ধরবে। মমতা ছটফট করে বেড়ায় মাঝে মাঝে গৌরীর কাছে এসে ফিসফিস্ করে বলে 'বিবেককে দেখে এলাম গৌরীদি। হাবমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছিল।' শংকর কাছে ছিল এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করল "না রে গৌরী ও বিবেক নয়, রাজকুমারী। বাত্রি বেলায় ও বাজকুমারী সেজে কেঁদে কেঁদে গান গাইবে।"

"আহা তোমায় বলেছে! না গৌরীদি সুপ্রিয়দা বলছিল ওই বিবেক সাজবে। সুপ্রিয়দাব সঙ্গে যাত্রাদলের ম্যানেজাবেব খুব ভাব হয়েছে!"

"ভাব না ছাই! ভাস্করদাকে তুই জিজ্ঞেস করিস্ গৌরী, দেখিস্ কার কথা সত্যি?"

"দাদা ছাই জানে! দাদা কি বাড়ী থাকে? সেই তো পড়া শেষ করেই কোথায় বেরিয়ে গেছে। মাকে বলছিল ওর নাকি এ সব যাত্রা ভাল লাগে না—।"

এমনি কবে এক সময় সন্ধ্যা হয়। ওরা সেজেগুজে যাত্রাব আসরে গিয়ে বসে। মেয়েদের চিকের আড়ালে বসবার ব্যবস্থা, ছেলেরা আসরের চার পাশ ঘিরে বসেছে। যাত্রা সুরু হয়। এক

ঝাঁক সখী নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে গান গাইছে। গায়ে ওদের সলমা চুমকীর ঝকমকে পোষাক। পায়ে গোড়ালী পর্য্যন্ত ঝুলের জরির কাজ করা পায়জামা খোলা চুলে ফুলের মালা। গানের সঙ্গে হারমোনিয়াম ডুগী তবলা বাঁশী বেহালা বাজছে। শঙ্কব উদগ্রীব হয়ে আছে কখন যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ হবেই তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ওর। রাজা যেভাবে চোখ মুখ পাকিয়ে গর্জন করছে আর একটি ফুটফুটে ছেলেকে দাঁতে পিষে ফেলছে তাতে মনে হয় ছেলেটিকে উদ্ধার করতে এখনি মাতা চণ্ডীর আবির্ভাব হবে। ছেলেটিব কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে জোড়াসন করে বসে রিনরিনে মিষ্টি স্বরে চণ্ডীপাঠ করছে। জহ্লাদ ছুটে এল, ঝকঝকে একটা খড়গ হাতে দ্বহাতে খড়গ তুলে ছুটে গেল ছেলেটির কাছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে, চোখ বড় বড় করে, খড়গ তুলেছে জহ্লাদ কিন্তু হাত আর নীচে নামাতে পারছে না। যাত্রার জহ্লাদ মোশন নিচ্ছে। ছেলেটি চোখ বুঁজে হাত জোড় করে স্তব করছে। রাজা ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টিতে একবার জহ্লাদের দিকে একবার ছেলেটির দিকে চাইছে।

হঠাৎ যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল। সে কি বাজনা! বাজনার তালে তালে যেন শরীরের রক্ত ছোটাছুটি করে। গ্রীনরুম থেকে আসরে আসবার রাস্তাটা দুপাশে বেড়া দিয়ে ঘেরা দূর থেকে শোনা যায় তীক্ষ্ণ চিৎকার 'রে রে পামর শব্দ লক্ষ্য করে সকলের দৃষ্টি ফিরে যায় সেইদিকে। উত্তেজিত শঙ্কর তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। পেছনের লোক হাঁ হাঁ করে ওঠে 'এই খোকা বসে পড় বসে পড় দেখা যাচ্ছে না।' কে একজন টেনে বসিয়ে দেয় শংকরকে।

উন্মুক্ত খড়্গ হাতে ছুটে এসে আসরে দাঁড়াল কালিকারূপিনী মাতা চণ্ডী। খোলা চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। চার হাত গলায় নৃমুণ্ড মালা, কোমরে মানুষের রক্ত মাখা হাত সার সার ঝোলানো---সাবধান, যদি আর একপদ হও অগ্রসর—এই খড়্গাঘাতে মস্তক তব লুটিবে ধুলায়। রণ-বণ-দেহ রণ—

—'দূর হও নারী। নারী সনে যুদ্ধে মোর নাহি অভিলাষ।'

—'ওরে মূঢ়! নারী বলি অবহেলা করোনা আমায়। আমি আদ্যাশক্তি আমি চণ্ডী—'

—'কে বা চণ্ডী নাহি চিনি তারে, একান্তই যদি রণে অভিলাষ তোর। রণসাধ আমি আজি মিটাইব তোর'—খড়্গে আর তরবারে ঠোকাঠুকি হয় কিছুক্ষণ, রাজার হাতের তরবারী মাটিতে পড়ে যায়। রাজার পিছনে খড়্গ ঘোরাতে ঘোরাতে যাত্রার আসর থেকে গ্রীণ-রুমের দিকে চলে যায় কালিকা রূপিণী মাতা চণ্ডী। যুদ্ধের বাজনা তখন জোর কদমে চলেছে। বেহালা বাজনাদার বেহালা কাঁধে উঠে দাঁড়িয়েছে আসরে অন্য বাজনাও তার সঙ্গে তাল রেখে বেজে চলেছে। আবার ফিরে আসবে যোদ্ধারা। একটার পর একটা রোমাঞ্চ, একটার পর একটা শিহরণ। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, মাতঙ্গিনী, কমলা, বগলা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী—এদের সবারই সঙ্গে একে একে যুদ্ধ হবে।

যাত্রার আসরে যেন একেবারে ডুব দিয়েছিল শংকর হঠাৎ ওর পিঠের ওপর হাত রাখল ভাস্কর।

—"কি এত দেখছিস্ বসে বসে? এর চেয়ে মুকুন্দদাসের যাত্রা গান অনেক ভাল। তাতে দেশের কথা থাকে, পরাধীনতার কথা থাকে। আমার ঘুম পাচ্ছে আমি বাড়ী যাচ্ছি।"

ভাস্কর উঠে যায় আসর থেকে।

মুকুন্দদাসের যাত্রা। চারণ কবি মুকুন্দদাস।

অনেক ছোটবেলায় এ যাত্রা দেখেছিল গৌরী জগত্তারিনী দেবীর সঙ্গে। আগের দিন খোলা মোটরে চেপে মহাত্মা গান্ধী গেছেন পাবনা শহরে সদর রাস্তা দিয়ে। ব্রিটিশের ভয় উপেক্ষা করে কাতারে কাতারে মেয়ে পুরুষ গান্ধী দর্শন করবার জন্যে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়েছিল।'গান্ধীজীকি জয়' বলে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। এর পরের দিনই মুকুন্দ দাসের যাত্রা হ'ল জেলা স্কুলের খেলার মাঠে।

সকাল বেলাতেই জগত্তারিনী দেবী ছেলেকে বললেন—'আমি কিন্তু মুকুন্দদাসের যাত্রাশুনতে যাব বরেন।'

—"এ স্বদেশী-যাত্রার কি দেখবে মা? নাচও নেই, জমকালো পোষাকও নেই, যুদ্ধও নেই, যুদ্ধের বাজনাও নেই"—

—"তা হোক্ আমি ওর গান শুনতেই যাবো। শংকর আব গৌরীও আমাব সঙ্গে যাবে।"

—"তা যেও। আমারও তো ওখানে ডিউটি পড়েছে।"

মমতা ঠোঁট ওলটালো—"তুমি যাও গৌরীদি। মুকুন্দদাসের যাত্রা আমার ভাল লাগে না। ঝলমলে সাজ নেই, মুকুট নেই, সখীদের নাচ নেই, রাজা নেই, রাণী নেই, ধেৎ এ আবার যাত্রা না কি?"

—"তুই বড্ড বোকা। এ হ'ল স্বদেশী যাত্রা আর ও হল যাত্রা—তফাৎ হবে না। শংকর তুই যাবি তো?"

—"বাবাঃ—যাবো না আবার। আমার বলে একটা গান শিখতে হবে।"

অতদিনের কথা কিন্তু এখনও মুকুন্দদাসের চেহারাখানা স্পষ্ট মনে আছে গৌরীর। কতকটা যাত্রা দলের বিবেকের মত। গেরুয়া রংএর আলখাল্লা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ী, বুকের ওপব অসংখ্য মেডেল ঝোলানো। গান তো নয় যেন এক একটা আবেদন, এক একটা জিজ্ঞাসা, এক একটা ধিক্কার। এ গান কথা বলে, ভাবায়, কাঁদায়, বিভোর করে। এ গান শুনে মেয়েরা তাদের সাধের কাঁচের চুড়ী আসরে ছড়িয়ে দেয়, এ গান শুনে মানুষ তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে চায়।

ভীড়ও হয়েছে তেমনি। যাকে বলে লোকে লোকারণ্য। মেয়েরা একপাশে বসেছে চিকের আড়ালে—আসরের আর তিন পাশে ছেলেদের বসবার জায়গা। যাত্রার আসরে বাজনা বাজছে; সবাই উদ্গ্রীব হয়ে আছে কখন যাত্রা স্বুরু হবে। আসরে বাজনার

সুর বদলাল—সকলেই নড়ে চড়ে বসল। আসর কাঁপিয়ে তুহাত তুলে ছুটে এসে দাঁড়ালেন চারণ কবি মুকুন্দ দাস—

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান,
তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে
এমনি অভিমান তোমার এমনি অভিমান।
চিরদিন টানবে পিছে চিরদিন রাখবে নীচে
এত বল নাই রে তোমার সবে না সেই টান।
শাসনে যতই ঘের, আছে বল তুর্বলেরও
হওনা যতই বড়, আছেন ভগবান।
আমাদের শকতি মেরে, তোরাও বাঁচবি নেরে
বোঝা তোর ভারী হলেই, ডুববে তরীখান।

এরপর মুকুন্দদাসের গলার স্বরে বেজে উঠল একটা আকুতি। মেয়েদের চিকের দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাতজোড করে অনুনয়ের ভঙ্গীতে তিনি গান ধরলেন—

'ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী কভু আর হাতে পরো না,
জাগ গো ও জননী, ও ভগিনী, মোহের ঘুমে আর থেক না।
কাঁচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে কলঙ্ক আর হাতে পরো না
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী, ধর্মসাক্ষী জগৎ ভরে আছে জানা।
চটকদার কাচের বালা, পুঁতির মালা তোমাদের অঙ্গে শোভে না
বলিতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে কোটি টাকার কম হবে না ;
পুঁতি কাঁচ ঝুটো মুক্তোয় এই বাংলায় নেয় বিদেশী কেউ জানে না
ঐ শোন বঙ্গমাতা শুধান কথা জাগো আমার যত কন্যা
তোরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন বিদেশে উড়ে যাবে না।'

চিকের আড়াল থেকে মেয়েদের অসংখ্য হাত বাইরে বেরিয়ে এল। তারা তাদের হাত থেকে কাঁচের চুড়ী, গলা থেকে পুঁতির মালা খুলে খুলে আসরের দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন। পুঁতির মালা

আর কাঁচের চুড়ীর স্তূপ আসরে জমে উঠল। সেদিন যাত্রার আসর থেকে আসবার সময় জগত্তারিনী দেবী তাঁর হাতের আংটিটি খুলে দিয়ে এসেছিলেন মুকুন্দ দাসের হাতে।

মমতা তখন পনেরো পেরিয়ে ষোলই পা দিয়েছে। সেদিন তার একটা অদ্ভুত খুসী খুসী ভাব। হাঁটা, চলা, কাজকর্ম সব কিছুতেই যেন খুসী জড়ানো। কেমন যেন একটা অনায়াস ভঙ্গীতে ঘুরে বেড়ায় মমতা। ওর শরীরের গ্রন্থিগুলি যেন আবেশে আচ্ছন্ন। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ও বাবা মার কথা শুনেছে। মা বলেছেন—'যেমন করে হোক্ সুপ্রিয়র বাবাকে রাজী করাতেই হ'বে। ওর সঙ্গে হেসে খেলেই তো মেয়ে আমার বড় হ'ল। যেমন করে হোক টাকা পয়সা জোগাড় করে এ বিয়ে দিতেই হবে।' সকালে টুকিটাকি কাজ সেরে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায় মমতা।

—'তুমি চান করতে যাও মা, আমি ঝোলটা নামিয়ে ভাত বসিয়ে দিচ্ছি।'

মা মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে হাসেন—'তুই আর ক'দিন করবি মা, তারপর তো নিজেকেই সব করতে হবে।' মমতা লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করল।

লজ্জিত মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন মা মুগ্ধচোখে। সংসারের নানা ঝামেলায় মেয়েটার দিকে চেয়ে দেখবারও সময় পান না তিনি তাই হঠাৎ মেয়ের ভরাট মুখে যৌবন সন্ধির কমনীয় রূপটুকুর দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন মা। লাল নীল চেক্ কাটা সাড়ীখানায় সুন্দর মানিয়েছে মমতাকে। ভাবলেন সুপ্রিয়র মত অমনি ছিমছাম ছেলেকে ওর পাশে এনে দাঁড় করালে আরও সুন্দর মানাবে।

—"দাদা কলকাতা থেকে কবে আসবে মা ?"

—"লিখেছে তো পূজোর সময় আসবে। কতবার ছেলেকে লেখা হ'ল ওসব আর্ট স্কুলের পড়া ছেড়ে বাড়ী চলে আয়। এখানে ঘরের

ভাত খেয়ে একটা মাষ্টারী টাষ্টারী কর বাপের মত—তা না ছেলে আমার ছবি আঁকা শিখবে, একজিবিসনে হাজার হাজার টাকায় তা বিক্রি হবে। দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেছে মানুষ খেতে পাচ্ছে না। তোর ছবি এখন কে কিনবে রে বাপু ?"

—"বা রে যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ কি চিরদিনই থাকবে ? যুদ্ধ টুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে দেখ দাদা কত বড় হবে—দেশ জোড়া নাম হবে তার।"

—"হ্যাঁ রাধাও নেচেছে—সাতমণ ঘিও পুড়েছে।"

আট

কোথায় গেল সেদিনের সেই সব মানুষ—চন্দ্র দে, লালদি। তারা কি সত্যই নিঃশেষ হয়ে গেছেন স্বাধীন ভারত থেকে। কই আর তো তাদের দেখতে পাওয়া যায় না ? আজ পথে ঘাটে যাদের দেখতে পাওয়া যায় তারা তবে কারা ? কে তাদের সৃষ্টি করেছে ? স্কুলে, কলেজে, ট্রেনে, অফিসে, কারখানায় যাদের দেখতে পাওয়া যায় তারা তবে কারা ?

—"কি হচ্ছে এ সব ? নিজেদের প্রপার্টি নিজেরা কেন এমন করে নষ্ট করছ ? এতে যে তোমাদেরই ক্ষতি হবে ?" ট্রামে পেট্রল ঢালতে দেখে পথচারী একজন বৃদ্ধ মন্তব্য করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মস্তানের দল তাকে ঘিরে ফেলল—"দাদু জ্ঞান দিচ্ছে রে"—

—"মার শালাকে"

—"শালার কাপড় খুলে নে"—

"বাবারা, মাথা ঠাণ্ডা করে আমার কথা শোন।"

—"দে না শালাকে একটা রদ্দা কসিয়ে।"

"—বাবা— !"

—"আবার বাবা! তা বাবা যখন বলেছ, বাবার কাজের

সমালোচনা করো না, কেটে পড়।"

—"ও মশাই করছেন কি? মারা পড়বেন যে। ভালকথা শোনাবার আর লোক পেলেন না? ঐ সব গুণ্ডাদের—"

বাস আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে দক্ষযজ্ঞ। মৌচাকে যেন ঢিল পড়েছে। কেউ লাথি, কেউ ঘুসি, কেউ গাট্টা। একজন এসে ওকে জাপটে ধরল আর একজন ওর প্যাণ্টটা খুলে নিয়ে ফেলে দিল। এবারে ভদ্রলোক জড়সড় হয়ে বসে কেঁদে ভাসাতে লাগলেন কিন্তু তাতেও ওদের দয়া হ'ল না। ওরা ওকে ঘিরে অশ্লীল ভঙ্গী করে টুইষ্ট ড্যান্স নাচতে লাগল—তারপর শুরু হ'ল খেস্তাখিস্তি।

এরাই এখন নববঙ্গের নবযুগের চালক। স্বাধীন ভারতের নবতম সৃষ্টি। এরাই ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বিনয়, বাদল, দীনেশের উত্তরপুরুষ। আজকের 'নেই নেই' সাজে সজ্জিতা, ধারকরা বিরাট রুক্ষকবরী শোভিতা, আধুনিকারাই শান্তি, সুনীতি, প্রীতির উত্তর সাধিকা। এদের বুকে পরাধীনতার গ্লানি নেই, স্বাধীনতার আনন্দ নেই, সৃষ্টির তন্ময়তা নেই, আত্মত্যাগের উদ্দীপনা নেই। এরা এক একটি জৈবিক উপাদানের যন্ত্র আর কৃত্রিমতার ফানুষ। এরাই স্বাধীন ভারতের 'লেটেষ্ট' প্রোডাক্সন।

যৌবন সর্বদেশে সর্বকালে সৃষ্টিছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া। অতৃপ্ত আকাঙ্খার উন্মাদনায় তারা ছুটে চলে। তারা ভুল করে পথভ্রান্ত হয়, পথ ক্লান্ত হয় তবু কিছুতেই তারা পথ পরিবর্ত্তন করে না। তারা অবিরাম গতি। তাদের এই গতিকে সত্যের পথে, মঙ্গলের পথে, সুন্দরের পথে চালিত করবার দায়ীত্ব যাদের ছিল তারা কি তা পালন করছেন? দোষ কার? দায়ীত্ব কার?

সেদিন পাড়ার ছেলে ঝাণ্টুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল সুর্পণার। —"জানেন সুর্পণাদি! যখন ডিস্‌টিংসন পেয়ে বি, এ পাশ করলুম, মনে কি আনন্দ, কি উৎসাহ। মনে হল সব কিছু সমাধানের চাবিকাঠি বুঝি আমার হাতে এসে গেছে। বাবা মারও সে কি

আনন্দ। 'এবারে ঝাণ্টু চাকবী করবে সংসারের অভাব ঘুচবে। বিয়ে করে বৌ ঘরে আনবে—আরও কত কি।' নিয়মমাফিক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রি করলুম বছর খানেক অপেক্ষা করবার পর ইনটারভিউও পেলুমও তু একবার কিন্তু কই? বি এ পাশ করে আজ প্রায় চার পাঁচ বছর বসে আছি। গায়ে অসুরের বল, একটা কিছু করবার জন্য হাত নিস্‌পিস করছে কিন্তু করবোটা কি? আজকাল ঘরে গেলে মা মুখ ঝাপটা দেন, বাবা মুখ ফিরিয়ে নেন। কাজেই ঐ নাওয়া খাওয়ার সময় ছাড়া বাড়ীতে যাওয়ার পাটও তুলে দিয়েছি। আমরা রক্‌বাজী ছাড়া আর কি করতে পারি বলুন? অদম্য প্রাণশক্তি যখন আমাদের বেশি চঞ্চল করে তখন আমরা টুইষ্ট নাচ নাচি,সিনেমার গান গাই, মেয়ে দেখলে—"মাঝ পথেই থেমে যায় উচ্ছ্বসিত ঝাণ্টু। লজ্জা পেয়ে বলে—"কিছু মনে করবেন না সুর্পণা দি। খেস্তাখোস্তি করতে করতে ভাসার ওপর আর কনট্রোল নেই। সংক্রামক ব্যধির মত সকলে আমাদের এড়িয়ে চলে, আমাদের ঘেন্না করে, ভয় করে, কিন্তু আমাদের কেউ ভালবাসে না। আমাদের জন্যে কারও মনে এতটুকু সহানুভূতিও নেই। অথচ গুণ্ডাবাজী করবার প্রয়োজন হলে আবার ওরাই আমাদের ডাকেন! 'চা খেও' বলে টাকাটা সিকেটা হাতে গুঁজে দেন, ওতেই আমরা কৃতার্থ হয়ে যাই। আমরা কিছু করতে চাই-সুপর্ণাদি। আগের দিন হলে দেখতেন আমরাই গিয়ে ভ্রাম ভ্রাম করে রিভলভার চালাতুম, সায়েব মারতুম। ফাঁসীর দড়ি গলায় পরে ইতিহাসের নায়ক হয়ে বসতুম।—"

ভাস্করের কোটরগত চোখ তুটো জ্বলে উঠত মাঝে মাঝে, বলত "চোখের জল দেখে মনে করো না আমি তুর্বল হয়ে গেছি। লালদি, চন্দ্র দা, বাবা, মমতা এদের জীবনের বদলে জীবন নেবার সংকল্পই নিয়েছিলুম আমি কিন্তু সে সুযোগ আমি আর পেলুম না। কারা প্রাচীরের অন্তরালে ওরা তিলতিল করে আমায় মৃত্যুর পথে, ধ্বংসের

পথে ঠেলে দিল।"

—"মমতা আর তোমার বাবার মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী, জীবন দিয়েই তাঁদের সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। মমতার মৃতদেহ স্পর্শ করে সুপ্রিয়দা একদিন যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা তিনি রক্ষা করেছেন। ছিদাম মাঝি আমায় তার লেখা একতাড়া কাগজ দিয়েছিল তাতেই সব লেখা আছে।—"

—"এই স্বাধীনতা আন্দোলনে আমি বার বার লক্ষ্য করেছি গৌরী! ছেলেরা মেয়েদের কাছে আর মেয়েরা ছেলেদের কাছে সব সময়েই হিরো আর হিরোইন হতে চায়। সে দিন লালদি'র সেই অসুর নাশিনী দুর্গা মূর্ত্তি আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। আমার হাতে একটা রিভলভার গুঁজে দিয়ে লালদি বলেছিলেন- পুলিশ বাড়ী ঘিরে ফেলেছে ভাস্কর, তোমার চন্দ্রদাকে যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে। 'চন্দ্রদার হাতেও রিভলভার। আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। লালদি ছুটে এসে তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন-'এতদিন পরে কি এমনি ভাবেই তুমি ধরা দিতে চাও? ছাদের ওপর কাঠের পাটাতন ফেলে তুমি পালিয়ে যাও। এদিকটা আমি সামলাতে পাববো।' লালদির মুখের দিকে চেয়ে হেঁসেছিলেন চন্দ্র দা। সে উপায় থাকলে এতক্ষন কি আমি দাঁড়িয়ে থাকি?'

বাড়ীর দরজায় তখন ধাক্কা পড়ছে—'দরজা খোল—দরজা খোল। তা না হলে দরজা ভেঙ্গে ফেলব।' শেষ পর্য্যন্ত দরজা ভেঙ্গেই বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়েছিল ওরা। চন্দ্রদা তো সাধারণ নন। তিনি যে একটা যুগের প্রতিনিধি। সেদিন আমিই প্রথম এগিয়েছিলাম। তিনবার গুলি ছুঁড়লাম-কিন্তু তিনটি গুলিই লক্ষভ্রষ্ট হল। হঠাৎ আমার হাতে এসে লাগল একটা গুলি— আমার হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল। ছুটে এসে রিভলবার হাতে তুলে নিলেন লালদি, চীৎকার করে উঠলেন—কি চান আপনারা?

—'চন্দ্রনাথ দে কে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন। তাকে চাই আমরা।'

—'চন্দ্রনাথ দে কে আমরা চিনি নে—'

—'ভাল কথা! আপনি তা হলে দরজা থেকে সরে দাঁড়ান আমরা ভেতরে গিয়ে দেখতে চাই।'

—'ভেতরে যেতে দেব না আপনাদের'—দ্রাম—দ্রাম—দ্রাম। লালদি গুলি ছুঁড়ছেন। হঠাৎ একটা গুলি ওধার থেকে এসে আমার পায়ে লাগল আমি পড়ে গেলাম।'

লালদির চুল খুলে গেছে, শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে, ঘামে গলে কপালের সিঁদুর গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে। লালদির গুলিতে ওদের দলের দুজন গড়িয়ে পড়েছে সিঁড়ি দিয়ে। চন্দ্রদা এসে দাঁড়ালেন লালদির পাশে। লালদি চীৎকার করে উঠলেন—'আমি বেঁচে থাকতে তোমায় ধরা পড়তে দেব না।' চন্দ্রদাকে আড়াল করে দাঁড়ালেন লালদি।"

—তোমাদের দলের সেই টিকটিকিকে মনে আছে তো?

—"কার কথা বলছো?"

—"ওমা এরই মধ্যে ভুলে গেলে। চন্দ্রদার খবর ওই তো জানিয়েছিল পুলিশকে। তোমাদের সেই চায়ের দোকানের মালিক নিমু বোস।"

—"কিন্তু নিমু তো খুব বিশ্বাসী ছিল! আমাদের পার্টির টাকাতেই তো ওর দোকান চলতো—"

—"তা চলতো, কিন্তু সেদিন তোমার যখন চন্দ্রদাকে নিয়ে ওর দোকান থেকে বেরিয়ে এলে। ওই গিয়ে পুলিশকে খবর দিয়ে ছিল। তার প্রতিদান অবশ্য ও পেয়েছে। ব্রিটিশ সরকার ওকে মানুষ হয়ে আসবার জন্যে বিলেত পাঠিয়েছিল নিজের খরচায়। দেশ স্বাধীন হবার পর ও দেশে ফিরে এসে মস্ত বড় দেশ নেতা হয়ে উঠেছে। এখন ও মস্ত বড়লোক।"

—"তাই বুঝি ?" হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায় ভাস্কর।

—"কি হল ? আবার কি ভাবতে বসলে ?"

—"লালদির কথা। সেদিন দুচোখ ভরে আমি লালদিকে দেখেছি।" আবার ভাবনার মাঝে ডুবে যায় ভাস্কর।

এপারে সে ওপারে লালদি। দুজনের মাঝখানে মৃত্যুর ব্যবধান। জীবন পণ না করলে সেখানে পৌঁছান যায় না।

আশঙ্কা আর আতঙ্কের বুঝি একটা সীমা আছে। সেই সীমায় এসে পৌঁছে গেলে ও দুটোই কেটে যায়। সেই জায়গায় আসে সাহস। দুর্জয় সাহস। সহসা সেই সাহসই পেয়ে বসেছিল লালদিকে, দুর্জয় এক সংকল্পে ওর ঠোঁট দুটি দৃঢ় সংবদ্ধ হল। নিজের মন স্থির করে ফেললেন তিনি। প্রাণ দেওয়ার এ সুবর্ণ সুযোগ তিনি হারাবেন না। সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারের যুপকাষ্ঠে আশা, আকাঙ্ক্ষা, সম্ভাবনাভরা দুটি জীবনের অবসান ঘটে গেল।

চন্দ্রদা এসে দাঁড়িয়েছেন লালদির পাশে, তাঁর হাতেও রিভলভার' আহত ভাস্কর পড়ে আছে সিঁড়ির ওপর। তাকে টেনে ভেতরে নিয়ে এলেন চন্দ্রদা। যুদ্ধ এমন একটা অবস্থা যা মানুষকে ভেঙ্গে পড়তে দেয় না, কারণ তারমধ্যে কোথাও থামবার বা থমকে দাঁড়াবার কোনও অবসর থাকে না। দুঃখ, শোক, বেদনা এইগুলো অনুভব করবার—বা তাতে বিহ্বল হবাব একটু সময় দরকার—সেটুক সময়ও যুদ্ধের সময় থাকে না।

অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য। একদিকে সিঁড়ির নীচে হাঁটু মুড়ে পজিসন নিয়েছে অগনিত পুলিশ আর একদিকে সিড়ির মুখে লালদি আর চন্দ্রদা। একদলের হাতে শক্তিশালী রাইফেল, অন্যদলের হাতে স্বল্প পাল্লার রিভলবার। উদ্যত রাইফেল, থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ছে। বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে বারুদের গন্ধে। রাতের অন্ধকার জমাট বেঁধে গেছে। হোক জমাট অন্ধকার, থাক দূরত্বের ব্যবধান তবু সে গতি, সে দেহ ছন্দ, ভুল হবার নয়। ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত

পড়ে জায়গাটা ভিজে গেছে। চেতনা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে আসছে ভাস্করের। হঠাৎ চন্দ্রদার চাপা গলার স্বর শুনতে পেল ভাস্কর—' গুলি শেষ হয়ে গেছে রাণী—শেষ দুটি গুলি আমার হাতে। তুমি কি আত্মসমপর্ণ করতে চাও।'

—'পাগল'—হা হা করে হেসে উঠলেন লালদি। হাতের রিভলবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলেন চন্দ্রদাকে।

'এবারে আমার ইজ্জৎ তোমার হাতে। তোমার ঐ শেষগুলি দিয়ে আমার ইজ্জৎ রক্ষা কর'—থরথর করে কাঁপছেন লালদি। বসন্তে নূতন বাতাস লাগা, নতুন পাতার মত।

পূব আকাশে তখন রঙ ধরেছে। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে একটু একটু করে। বিশ্বাস অবিশ্বাসে ভরা সে কাহিনী। ঘুমে জাগরনে ভরা তার চৈতন্য। তবু একসময় বিশ্বাস করতে হয়। বারুদের গুঁড়ো এতধূলো এত বালিতেও সে অনিন্দ্য লাবণ্য ম্লান করতে পারেনি। লালদির বক্ত মাথা দেহ, রক্ত চন্দন মাখা পদ্মের মত পড়ে আছে একপাশে। চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে দেখল ভাস্কর—পাশাপাশি দুটি মৃতদেহ—একটি লালদির আর একটি চন্দ্রদার। দুটি মৃতদেহের সঙ্গেই তার আহত দেহখানা ফেলে রাখা হয়েছে হাতে পায়ে কড়া লাগিয়ে। নড়বারও ক্ষমতা নেই তার। পুলিশভ্যান তখন বিজয়গর্বে ছুটে চলেছে লাল বাজার থানার দিকে।

স্বাধীন ভারতের সরকারী—যক্ষ্মা হাসপাতালের ১৩ নং বেডে শুয়ে শুয়ে এমনি কত কথা বলতো ভাস্কর। পাঁচটায় অফিসের ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুপর্ণা চলে আসত ভাস্করের কাছে ভাস্করকে দেখতে। বসে বসে এটা ওটা খাওয়াতো আর গল্প করতো।

—"জান শীগগীরি তোমায় ছেড়ে দেবে হাসপাতাল থেকে। তোমার জন্যে একখানা ঘর আমি সাজিয়েই রেখে দিয়েছি। দক্ষিণ খোলা—বারান্দায় মাধবী লতার গাছ লাগিয়েছি টবে। রজনীগন্ধা,

দোলনচাঁপা, বেলি এসব ফুলেরও কতগুলো টব রেখেছি যেখানে। তুমি যে রকম ভালবাস, সবই ঠিক সেই রকম করে সাজিয়েছি। কত ফুল ফুটছে জান? তোমার ঘরে দু আলমারী বই রেখেছি আর একটা আলমারীতে তোমার আঁকবার সরঞ্জাম। ইজেলটা এমন এক কোনে বসিয়েছি—যেখান থেকে বাইরের আকাশও দেখা যায়। রাত্রে যদি ছবি আঁক তারও ব্যবস্থা আছে। 'হাই পাওয়ারের' ফ্লাড্ লাইট ফিট করে রেখেছি। তোমায় নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি আমি।"

ভাস্কর শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে গৌরীর দিকে। বলে—তোমার মনে এখনও এত কল্পনা গৌরী, কিন্তু আমরা যে ফুরিয়ে গেছি। আমাদের সেই প্রথম কদম ফুলের পাপড়ী গুলো যে ঝরে গেছে অনেক দিন আগে। আজও তুমি স্বপ্ন দেখ!"

—"মানুষ কোনদিন ফুরিয়ে যায় না শিল্পী। তোমার পাশে এলে অতীতের দুঃস্বপ্নের দিনগুলো আমি অনায়াসে ভুলে যাই।"

—"আমার এই কঙ্কালসার জরাজীর্ণ দেহটাকে দেখেও তুমি, সেদিনের আমায় খুঁজে পাও গৌরী।"

—"তোমার মুখে এমন কথা মানায় না শিল্পী। তোমার মনে পড়ে ভাগিরথীর উৎস মুখ? যেখান থেকে ভাগিরথী উচ্ছল চঞ্চল ছন্দে ঝাঁপিয়ে নেমে এসেছিল? সে কি কলরব সে কি উন্মাদনা, চপলতা? তারপর বহুপথ ঘুরে যখন ভাগিরথী এসে সমুদ্রে মিশেছে সেখানে সে শান্ত, একাকার। সমুদ্র তার নিজের অস্তিত্বের মাঝে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তুমি তো আমার কাছে একটা রক্ত মাংসের পিণ্ড নও শিল্পী? তুমি যে আমার কাছে একটা ভাব, একটা অস্তিত্ব, একটা সত্তা।"

ভাস্কর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। ওর মন হঠাৎ সুদূর অতীতে তলিয়ে যায়। ছেলেবেলার সেই লাল ডুরে সাড়ী পরা বাক্যবাগীশ মেয়েটি। প্রথম দিকে ওকে দেখলেই পালাত গৌরী। ধীরে ধীরে ওদের পরিচয় হল। ভাস্কর বলতো—তোমার বাবাকে তোমরা এত

ভয়ঙ্কর কেন ? তিনি কি বাঘ যে তোমাদের খেয়ে ফেলবেন।'

—"আমার বাবা যে ভগবানের মত ভাল তাইতো তাকে ভয় করি—"

—"ভগবানের মত ! আচ্ছা বলতো ভগবান মানে কি ?"

—"ভগ যার আছে তিনিই ভগবান অর্থাৎ সমগ্র ঐশর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান আর সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টি গুন যায় আছে তিনিই ভগবান" —কর গুনে গুনে উত্তর দেয় গৌরী। তারপর ফিক করে হেসে বলে—"বুদ্ধি দিয়ে তাকে বুঝতে যেও না যেন—পারা যায় না—সেই ইন্দ্রিয় সকলের নেই।"

—"এত কথা তুমি শিখলে কোথায় গৌরী"—

বাবার কাছে ; আমার বাবা যে রোজ সকালে বিষ্ণু পুরান, গীতা বেদ সব পড়েন আমিও বাবার কাছে সব শিখি, মুখস্ত কবি। ঠিক ঠিক বলতে না পারলে বাবার কাছে বকুনী খাই।"

—"শংকর যে আমাব সঙ্গে মেশে তোমার বাবা জানেন ?"

—"ও মা জানেন না আবার। বাবা সব জানতে পারেন।"

—"তুমি যে আমার সঙ্গে কথা বলছ, তাও জানতে পারবেন ?"

- "ও মা তা পারবেন না। শংকর যে লুকিয়ে লুকিয়ে আপনাকে বন্দুকের লাইসেন্স দেয় তাও জানতে পেরেছেন বাবা।"

—"বলকি গৌরী ? এতজেনেও তিনি কিছু বলেন না—"

—"বলবেন ঠিক, এটা যদি অন্যায় হয় তা হলে ঠিক বলবেন।"

—"তোমাব বাবা তো ব্রিটিশের চাকর। প্রভুদের মনোরঞ্জন কবাই তো তার কাজ। একদিন তিনি ঠিক আমায় ধরিয়ে দেবেন।"

"চাকরী কবলেই সবাই চাকর হয় না, জানেন। আপনার বাবা ইস্কুলে চাকরী করেন তিনি কি চাকর ? তিনি কি সায়েবদের মন জুগিয়ে চলেন ?"

—"তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালবাস, না ?"

—"ভালবাসা কি মুখে বলে বোঝান যায় ?" লাল ডুরে শাড়ী

পরা বারো বছরের মেয়ে গৌরী ষোল বছরের ছেলে ভাস্করের কথার উত্তর দেয়।

—"তুমি কিন্তু খুব পাকা পাকা কথা বল গৌরী—"

—"বেশ করি, আমার সঙ্গে কথা না বললেই পারেন। আমি কি যেচে আপনার সঙ্গে কথা বলতে গেছি। আপনিই তো ডাকলেন আমায়। যাই—তাড়াতাড়ি ডুবটা দিয়ে জল নিয়ে বাড়ী যাই। আমি জল নিয়ে গেলে তবে ঠাকমা ডাল চাপাবেন। কুয়োর জলে তো আর ডাল সেদ্ধ হবে না।"

—"রাগ করলে গৌরী"—গৌরী ততক্ষণে তার ছোট্ট পেতলের কলসীটা নিয়ে তরতর করে ইছামতীর জলে নেমে পড়েছে। গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়ে একমুখ করে জল নিচ্ছে আর ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা ভাস্করের গায়ে তাক করে ছিটিয়ে দিচ্ছে।

নদীতে পালতোলা একটা নৌকো উজানে গুন টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নৌকার ছই এর নীচে মাঝি মাল্লারা রান্না চাপিয়েছে। মাটির হাঁড়িতে ফুটে ওঠা ভাতের গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। জল ছিটানো বন্ধ করে গৌরী ওদের দিকে মুখ ফেরায়।

—"ও মাঝি ভাই, ও ছিদাম মাঝি"—

—"ও মা গৌরীদিদি, তুমি গাঙের জলে গলা ডুবিয়ে বসে আছ। জোঁক লাগবে যে। তা খবর কি বল? কর্ত্তা ভাল আছেন? অনেকদিন এ অঞ্চলে আসা হয়নি।"

—"তা কোথায় চলেছ মাঝি ভাই। এত পাট বোঝাই নৌকো নিয়ে?"

—"গোয়ালন্দর ঘাটে যাবো গো দিদি"—

—"আমার জন্যে তরমুজ নিয়ে এস ছিদাম দাদা। ইস্ কি মিষ্টি! ভাবলেও জিবে জল আসে। এনো কিন্তু।"

"—তা যেন আনলাম। কিন্তু ঘাটের পৈঠেয় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উটি কে গো?"

একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে গৌরী বলে—"উটি সত্য পণ্ডিতের ব্যাটা ভাস্কর পণ্ডিত।"

—"তা মেয়েদের ঘাটে দাঁড়িয়ে করে কি ও?"

—"বর্গী তাড়াচ্ছে ছিদেম দাদা"—হি হি করে হাসে গৌরী আর আড়চোখে চায় ভাস্করের দিকে।"

—"এত কি ভাবছ বল তো?" গৌরীর কথায় চমক ভাঙ্গে ভাস্করের! একটু হেসে বলে—"অনেকদিন হয়ে গেল না?"

—"কাজ নেই, কম্ম নেই, বসে বসে উনি বছর গুনছেন। এই শোন, তোমার ঘরের জন্যে নতুন পর্দা কিনবো। কি রং কিনলে ভাল হবে বল তো? পর্দার রংএর সঙ্গে ম্যাচ করে বেড কভার, টেবিল ক্লথ, ফুলদানী সব কিনব।"

—"তুমি যে ঘরটাকে বাসর ঘর করে ফেলছ গৌরী—" ভাস্করের মুখের দিকে একটিবার চোখ তুলে চোখ নামিয়ে নেয় গৌরী। দিনান্তের শেষ আলোর মতই একটা নরম কোমল আভা ছড়িয়ে পড়ে ওর মুখে। আস্তে আস্তে বলে—"অন্যায় করছি কি?"

নয়

গৌরী ছোটবেলায় তার বাবার কাছে বসে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের গল্প শুনেছে। আজকের যুগের যে ছেলে তার বাবা মার কাছে খোকন, সেদিন সেই বয়সের ছেলেরা স্বাধীনতা সংগ্রামের বেদী মূলে নিজেদের জীবন আহুতি দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন আর সামরিক বাহিনীর অত্যাচার, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তারা অবনমিত চিত্তে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছে। তাদের বুকে ছিল দুর্জয় সাহস, তাদের সারা সত্বা ভরে ছিল আনন্দমঠের মহামন্ত্রে—'আমাদের মা নেই, বাপ নেই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই—

আমাদের কাছে কেবল সেই সুজলা সুফলা, মলয়জ সমীরণ শীতলা, শস্যশ্যামলা জন্মভূমি।' শুনতে শুনতে অতটুকু বয়সেও গৌরী বিভোর হয়ে যেত। বাবার গা ঘেঁসে উৎসুক দৃষ্টি তুলে জিজ্ঞাসা করত—'তারপর কি হল বাবা ?'

—'তারপর জালালাবাদ পাহাড়ের ওপর সার সার এগারটি চিতা সাজিয়ে এগারজন শহীদের মৃতদেহ তার ওপর তুলে দেওয়া হল। জ্বালানীকাঠ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল চিতাগুলো, তারপর তার ওপর পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। দাউ দাউ করে এগারটি চিতা জ্বলে উঠল। গুর্খা সৈন্যরা রাইফেল উল্টো করে ধরে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। পুলিশরা শেষ অভিবাদন জানালো ওদের, সায়েবরা মাথার টুপি খুলে হাতে নিল। দেখতে দেখতে তাদের দেহগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

'—ওকি রে গৌরী,—এই শংকর কাঁদছিস্ কেন ? ছিঃ কাঁদেনা, ওরা কি মরেছে, ওরা কি মরে কোন দিন ?'

'মরেনি।' শংকর আর গৌরীর চোখে জল, মুখে হাসি।

তাহলে বোধহয় ঠাকুমার গল্পের সেই রাজপুত্তুরদের মত সঞ্জিবনী জলের ছিটে দিয়ে ওদের আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে।

'না-রে ওরা মরেনি, কোনদিন ওরা মরে না। সেই এগারটা চিতার আগুন থেকে হাজার হাজার টেগ্‌রা, হাজার হাজার নিমল, হাজার হাজার পুলিন বেরিয়ে এসে চীৎকার করে উঠল—বন্দেমাতরম্

এই সামান্য কটা বছরে কোথায় হারিয়ে গেল সেই সব ছেলেরা। একটা তীব্র বেদনায় সুপর্ণার সারা দেহ মন যেন ঝিম ঝিম করে ওঠে। ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে স্বাধীন ভারতের একটা উৎসব মুখর দিন। 'দেওয়ালী উৎসব'! বাঙ্গালীদের কালীপূজো! স্থান বাংলা দেশে একটি ভদ্রপাড়া। বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় একশটি পরিবারের বাস সেখানে। প্রায় সকলেই উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী তাদের ছেলেমেয়েরা সবাই স্কুল কলেজে পড়ে, কেউ বা চাকরী করে।

সদর রাস্তার পিচ খুঁড়ে রাস্তার ঠিক মাঝখানে পূজো প্যাণ্ডেল বাঁধা হল। প্যাণ্ডেলের সামনে লাইট পোষ্টের সঙ্গে লাউড স্পীকার ফিট্ করা হ'ল। উৎসবের আগের দিন থেকে শুরু করে উৎসব শেষ হবার পরও আরও দুদিন ধরে পাড়ার ছেলের দল ক্রমাগত সিনেমার হিন্দী গান বাজাল—

"ক্যা কঁরু রাম মুঝে বুড্ডা মিল গয়া"—"ম্যয় পাগল হুঁ"—"ওগো শুনছ, এসো না এস কাছে এস।' কালীপূজোর আগের দিন রাত তখন প্রায় বারটা হবে। ছেলের দল প্রতিমা এনে বসালো একটা চৌকীর ওপর। মণ্ডপের দুপাশে দুটো ডাষ্টবিন যা সরাবার প্রয়োজন আছে বলেও ওদের মনে হল না। সারাদিন অফিসে খেটেখুটে এসে সবাই শুয়ে পড়েছে কিন্তু লাউড স্পীকারের আওয়াজে কেউ ঘুমুতে পারেনি। রাত একটায় রেকর্ড বাজানো বন্ধ করে তারা লাউড স্পীকারে মুখ দিয়ে সুর করল নানারকমের উদ্ভট গান আর আবৃত্তি, আর মাঝে মাঝে হুপ হুপ শব্দ করতে লাগল। পাড়ার সুবোধ ভট্চাজ আর সহ্য করতে না পেরে নেমে এলেন। পাড়ার মস্তানদের কাছে সবিনয় নিবেদন জানালেন 'রাত একটা বাজে এবারে লাউড স্পীকার বন্ধ করলে হোত না। রাত্রি দশটার পর তো বাজানোর কোন নিয়ম নেই।'

উদ্ধত দৃষ্টিতে সুবোধবাবুর মুখের দিকে চেয়ে একজন মস্তান বলে উঠল—'বন্ধ তো করা হয়েছে'—

—'তা হলে এখন যা হচ্ছে সেগুলো কি?'

—'পূজো টুজোর দিনে ছেলে ছোকরারা একটু আমোদ আহ্লাদ করেই থাকে।'

—'তার মানে তোমরা থামবে না; সারারাত ধরে এমনি আমোদ আহ্লাদ চালিয়ে যাবে'—

—'কি করব বলুন আমাদেরও তো রাত জেগে প্রতিমা পাহারা দিতে হবে?

—'তা হলে লাউড স্পীকারের মুখটা আমার বাড়ীর দিক থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দাও।'

'ঘোরানো আব সম্ভব নয় আমাদের ইলেকট্রিক তারের শর্টেজ আছে।'

সুবোধবাবু এবারে মরিয়া হয়ে উঠলেন—জান আমি হাই ব্লাড প্রেসার পেসেন্ট, বেশী উত্তেজনা হলে আমার হার্ট কোলাপস্ করতে পারে।

মস্তানরা এ ওর মুখের দিকে চেয়ে কি যেন ইসারা করল তার-পরই তারা উঠে গেল ওখান থেকে। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত একা একা দাঁড়িয়ে রইলেন সুবোধবাবু, তারপর চলে গেলেন। সুপর্ণাও সেদিন ঐ একই কারণে ঘুমোতে পারেনি। ঘরের আলো নিবিয়ে বসে ছিল জানালার পাশে। সুবোধবাবু চলে যাবার পরই ছেলের দল আবার ফিরে এল পূজো মণ্ডপে। একটা ছেলে ডাষ্টবিনটা পায়ের একটা কিক্ মেরে উল্টে দিল, আর একজন মুখে আঙুল ঢুকিয়ে পিঁক পিঁক আওয়াজ করে একপাক টুইষ্ট ড্যান্স নেচে নিল, আর একজন এগিয়ে এসে বলল—শ্লা ভট্চাজ হাই প্রেসার দেখাচ্ছিল রে, চল ডাষ্টবিনটা শ্লার বাড়ীর সামনে রেখে আসি।' 'দি আইডিয়া'—ডাষ্টবিনটা পায়ে করে ঠেলতে ওরা নিয়ে চলল সুবোধ বাবুর বাড়ীর দিকে। যখন ফিরে এল আনন্দে উৎসাহে ওরা ঝলমল করছে। সবাই সার বেঁধে গিয়ে প্রতিমার সামনে দাঁড়াল। প্রতিমার দিকে ইঙ্গিত করে চোখ টিপে একজন মস্তান বলে উঠল—'ফিগার খানা দেখেছিস মাইরী। আমাদের ফোর ফাদাররা আমাদের চেয়েও রসিক ছিল, বুঝেছিস্। ঠাকুর দেবতার নাম করে এমন একখানা দিগম্বরী মূর্ত্তি"—

—"এখনও তো প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি, আয় না একটু ফিনিশিং টাচ্ দিয়ে নি।"

শিউরে উঠল সুপর্ণা। সরে এল জানালার পাশ থেকে। ওর

কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, ওর মনে হোল অন্তরীক্ষ থেকে কে যেন বজ্র গম্ভীর স্বরে বলছে—"দেখ মা যা হইয়াছেন। অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃত সর্বস্ব এইজন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্ব্বত্রই শ্মশান, তাই মা কঙ্কাল মালিনী। আপনার শিব পদতলে দলিতেছেন, হায় মা।"

কালের গতির তালে তালে পা ফেলে ফেলে সুপর্ণা মুখার্জ্জিকেও চলতে হচ্ছে। জীবনের এই আবর্ত্তনে ও ক্লান্ত, বিরক্ত অসহিষ্ণু। আগে ওর মনে হোত বরেন মুখুজ্যের ফেলে যাওয়া সংসারের জন্যেই ওর বেঁচে থাকা। সীমা, শেখরকে মানুষ করবার জন্যেই ওর চাকরী। কিন্তু এখন ওর জীবন থেকে সকলেই সরে গেছে। সীমা এম, এ পাশ করে ভালবেসে বিয়ে করে বাঙ্গলার বাইরে মধ্য প্রদেশে চলে গেছে। শেখর ডাক্তার হয়ে একটা গভর্ণমেণ্ট হসপিট্যালের চার্জ নিয়ে চলে গেছে কলকাতার বাইরে। বিয়ে করে ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানেই সে সংসার পেতেছে। ওরা অকৃতজ্ঞও নয়। চিঠি দিয়ে দিদির নিয়মিত খোঁজ খবরও নেয়। আজ অফিসকে কেন্দ্র করেই ওর জীবনের চাকা ঘুরে চলেছে। একটা দুর্বিসহ হাহাকার, একটা অসহ্য যন্ত্রনা ওর জীবনটাকে ঘিরে রেখেছে। তবু ও বেঁচে আছে, কালের দাবী মিটিয়ে জীবনের ধারাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে মৃত্যু সাগরের দিকে।

দশ

১৯৪২ এর আগষ্ট মাস। ৯ই আগষ্ট। কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সেদিন স্কুল, কলেজ, দোকানপাট সব বন্ধ। সারা কলকাতা সহর থমথম করছে। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ আর মিলিটারী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

বরেন মুখুজ্যের তখন নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। ব্রিটিশ সরকার হাজার রকম দায়ীত্ব চাপিয়েছে তার মাথায়। দায়ীত্বের চাপে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন তিনি! নাইবার সময় নেই, খাবার

সময় নেই, সব সময়েই ইউনিফর্ম পরে কোমরে রিভলবার ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে তাঁকে।

দুর্গা তার ভাত নিয়ে বসে থাকেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয় তখনও বরেন মুখুজ্যে ডিউটি থেকে ফিরে আসেন না। দুর্গা তখন ছটফট করে একবার ঘরে এসে বসছেন আর একবার সদর দরজা খুলে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকছেন। গৌরী এসে মাকে বলে 'মা! তুমি আর কতক্ষণ না খেয়ে বসে থাকবে? বাবা হয়তো কোথাও বাইরে থেকে খেয়ে নিয়েছেন।

—"হ্যাঁ সেই মানুষই যে সে! তা হলে তো আমার দুঃখই থাকতো না।"

এমনি করে রাত হয়। অনেক রাতে ফিরে আসনে বরেন মুখুজ্যে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে। তখন সীমা আর শেখর ঘুমিয়ে পড়েছে। পড়ার ঘরে শংকর আর গৌরী তখনও পড়াশোনা করছে।

—"শংকর আর গৌরী কোথায়? বাড়ী ফিরেই জিজ্ঞাসা করলেন বরেন মুখুজ্যে।

—"ওরা পড়ছে—তুমি নাইতে যাও, আর দেরী করো না"—ষ্টোভ জ্বেলে খাবার গরম করতে বসেন দুর্গা। গরম জলের ওপর ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে দেন। স্নান করে এসে খেতে বসেন বরেন মুখুজ্যে। পাশে বসে তালপাখার হাওয়া করেন দুর্গা।

—"তুমি খেয়ে নিয়েছ তো? মুখখানা তো দেখছি শুকিয়ে গেছে। কি গো? কথা বলছো না যে। সারাটা দিন তাহলে না খেয়েই বসে আছ। তোমার নিয়ে আর পারিনে আমি।"

—"তুমি খাও তো! খেতে বসে অত কথা বললে বিষম লাগবে। দুধের মধ্যে আমসত্ত ভেজানো আছে, দুটি ভাত তুলে নিয়ে মেখে নাও। ওকি দুধমাখা ভাতগুলো আবার রেখে দিচ্ছ কেন? ওটুকু খেয়ে নাও। সারাদিন উপোষের পর এটুকু না খেলে বাঁচবে কি করে?"—

—“এটুকু প্রসাদ তুমি খেয়ে উপোষ ভাঙ্গবে”—হেসে আসন ছেড়ে উঠে পড়েন বরেন মুখুজ্যে।

ওদিকে পড়ার ঘরে বসে ভাই বোনে ফিসফিস করে কথা বলছে

—“তোদের কলেজের খবর কি ?”

—“খুব ভাল। ভাল অর্গানাইজ করা হয়েছে। কালকের প্রসেশনে থাকবে কোর্থ ইয়ার। শুনেছিস্ বোধহয় সুভাষ বোসের বাণী নিয়ে মিঃ হালদার ভারতে এসেছেন অর্গানাইজ করতে।”

—হ্যাঁ, তোর ভাস্করদা বলছিলেন।”

—“তোর সঙ্গে কোথায় দেখা হ'ল ভাস্কবদার ?”

—“কার্জন পার্কে। কাল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিটিং আছে, আমরা যাব কিনা জিজ্ঞাসা করছিলেন।”

—“কি করবি ? তুই যাবি তো ! জানাজানি হয়ে গেলে বাবার চাকবীটা যাবে।”

—“কিন্তু বাবা মার চাইতে তো দেশ বড়।”

—“আমার কি মনে হয় জানিস্। বাবা সব জেনেও আমাদের কিছু বলেন না”—

—“আর মা !”

—“মা তো বাবার ছায়া—।

১০ই আগষ্ট বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আর তার সমস্ত শাখাকে বে আইনী বলে ঘোষনা করা হয়েছে। একটা আসন্ন দুর্যোগের পূর্বভাষে সারা বাংলা দেশ তখন রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে।

১২ই আগষ্ট।

লেফট রাইট্—লেফট রাইট্, তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী হাজার হাজার তরুণ তরুণী। কংগ্রেস নেতাদেব গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে শান্ত মিছিল। লেফট রাইট—লেফট রাইট। পুলিশের কঠোর বেড়াজালের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে

চলেছে ওরা। হাতে ওদের ত্রিবর্ণ পতাকা, মুখে 'ব্রিটিশ ভারত ছাড়' শ্লোগান।

তখন জগৎ জুড়ে প্রলয় ঘনিয়ে এসেছে। ব্রিটিশের চলছে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ, আর অন্যদিকে জাপানের অগ্রগতি।

১৩ই আগষ্ট।

দলে দলে কাতারে কাতারে এগিয়ে চলেছে বাংলার তরুণ তরুণীর দল। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ত্রিবর্ণের জাতীয় পতাকা হাতে এগিয়ে চলেছে ওরা। প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরা তেজোদীপ্ত ভঙ্গীতে ওরা দাবী জানাচ্ছে—"ব্রিটিশ ভারত ছাড়—কুইট্ ইণ্ডিয়া"—। একসঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইছে

'বল নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল মা ভৈঃ মা ভৈঃ, জয় সত্যের জয়
বল হউক গান্ধীবন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয়।
বল মা ভৈ, মা ভৈ, পুরুষোত্তমের জয়।'

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, খিদিরপুর, যাদবপুর, কলকাতার বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে সমবেত হয়েছে ওয়েলিংটনে স্কোয়ারে। মাথার ওপর আগষ্ট মাসের প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজ। সেদিকে তাদের লক্ষ্য নেই। সেদিনের সেই ঐতিহাসিক শোভাযাত্রার বুঝি তুলনা নেই। ওয়েলিংটন স্কোয়ার তখন লোকে লোকারণ্য। সভা আরম্ভ হতে আর দেরী নেই। তিনজন ছাত্র বক্তৃতা দেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। জনতার দৃষ্টি তাদের মুখের ওপর। হঠাৎ হিংস্র নেকড়ের মত পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল জনতার ওপর। প্রচণ্ড লাঠির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ছাত্র তিনটিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের গাড়ীতে তোলা হল।

তখনকার মত পুলিশ অবস্থা আয়ত্ত্বে আনলেও এখানেই শেষ হল না। জন সাধারণ তখন ছাত্রদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারা ট্রাম বাসের আরোহীদের নেমে আসবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছেন,

ড্রাইভারদের ট্রাম বাস না চালাবার জন্যে অনুরোধ করছেন। শান্তি পূর্ণভাবেই তাদের অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে।

কিন্তু অবস্থা ক্রমশঃ ঘোরালো হয়ে উঠল। শ্রীমানী মার্কেটের কাছে পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন বৈদ্যনাথ সেন। আগষ্ট আন্দোলনের প্রথম শহীদ। আগুন জ্বলে উঠলো। আন্দোলন তখন সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে।

মেদিনীপুর বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের পীঠস্থান। গান্ধীজীর লবণ আইন আন্দোলনে যারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল, ১৯৪২ এর আন্দোলনেও তারা তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। ১৪ই আর ২০শে আগষ্ট হরতাল পালন করে তারা প্রতিবাদ জানালো ভারতীয় জন নায়কদের গ্রেপ্তারের। কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি কনটাই সাবডিভিসনাল কংগ্রেস সেক্রেটারী রাসবিহারী পাল, ঈশ্বরচন্দ্র মল, বিপিনবিহারী অধিকারী, সুধীরচন্দ্র দাস প্রভৃতি স্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল। ২৩শে আগষ্ট স্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আবার হরতাল পালন করা হল। আবার কতগুলি শিক্ষক এবং ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তার করে তাদের দুবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। ২৩শে আগষ্ট পুলিশ কনটাইএর কংগ্রেস অফিস খানাতল্লাসী করে বহু কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তার করা করল।

সীমাহীন ব্রিটিশ অত্যাচারের মুখে তখন মেদিনীপুরের প্রতিটি অধিবাসী, জনসাধারণ জর্জরিত। তাদের সাধারণ জীবনধারণ পদ্ধতিকেও তখন নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। জোর করে যুদ্ধের বণ্ড বিক্রী করা হচ্ছে সর্ব সম্প্রদায় জনসাধারণের মধ্যে। গরীব চাষীদেরও এর আওতা থেকে রেহাই নেই। সব রকম সভা সমিতি মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সাইকেল, নৌকা প্রভৃতি সব রকম যানবাহনকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সাধারণ জীবন যাত্রার

ওপর ব্রিটিশ সরকারের 'ডিনায়েল' পলিসি প্রতিটি মানুষকে তখন ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। অন্যদিকে মেদিনীপুরে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। দেশ থেকে সব রকম খাদ্য সামগ্রী উধাও হয়ে গেছে, যা আছে তা জনসাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ক্রমাগত অত্যাচারে গণ আন্দোলন সুরু হয়ে গেল কন্‌টায়ে। ছাত্র ছাত্রীরা স্কুল কলেজ বর্জন করে মিছিল করে রাস্তায় বেরিয়ে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবার আবেদন জানালো জনসাধারণের কাছে। সারা মেদিনীপুর জেলায় আগুন জ্বলে উঠল। সংঘবদ্ধ জনসাধারণের বেআইনি সভা অথবা মিছিলের সম্মুখীন হতে স্থানীয় পুলিশ সাহস পেল না। দলে দলে কাতারে কাতারে আশপাশের গ্রাম থেকে বহু লোক এসে কনটাই শহরে প্রবেশ করল। সমস্ত গর্বনমেণ্ট অফিস গুলিতে একটিও প্রানী নেই। সবাই প্রাণ ভয়ে পালিয়েছে।

বয়কট। বয়কট। দোকান, বাজার, স্কুল, কলেজ, ডাক্তার খানা—সব বন্ধ। দিনের পর দিন চলল এই অসহযোগ আন্দোলন। স্থানীয় পুলিশ আর সরকারী কর্মচারীদের তখন অনাহার চলছে ঘরে ঘরে, এরই মধ্যে স্থানীয় চৌকীদারেরা তাদের চাকরীতে ইস্তফা পত্র দাখিল করল। সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ। স্থানীয় ভলানটিয়াররা কনটাই, রামনগর জেলা বোর্ডের রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত করে কনটাই সহরকে সব কিছু থেকে বিছিন্ন করে ফেলল।

কনটাই সহরের রঙ্গপ্রিয় দুরন্ত ছেলে সঞ্জয় সেন। হাসি গানে মসগুল, কখনও বা নিশ্চল উদাসীন। মমতা ওর সবার ওপর। দীন দুঃখী, অনাথ ওর বড় আপন। ওদের নিয়েই ওর সংসার। এই মমতা থেকেই, একদিন জলে উঠল বিদ্রোহ বহ্নি—

"আমারে বাঁধবি তোরা সে বাঁধন কি তোদের আছে ?
আমি যে বন্দী হয়ে সন্ধি করি সবার কাছে।"

বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে সঞ্জয় সেন। মাঝে মাঝে বলত—বাঁচা মজা, মরাটা আরও মজা আর যুদ্ধে মরাটা সব চেয়ে বড় মজা।

আগষ্ট আন্দোলনের নায়ক হয়ে উঠল সঞ্জয় সেন।

বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ
নবযুগ ঐ এল ঐ
এল ঐরক্ত যুগান্তর রে।
বল জয় সত্যের জয়—
আসে ভৈরব বরাভয়
শোন অভয় ঐ রথ ঘর ঘর রে॥

একদিকে পুলিশ, অন্যদিকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নিরস্ত্র সৈনিক। "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"—।

পুলিশের গুলিতে ছয়জন নিহত এবং বহু আহত হল। অন্যায় অত্যাচারের আগুন ছড়িয়ে পড়ল সহর থেকে গ্রামে। পটাশপুর। খেজুরি, ভগবানপুরের পুলিশ ষ্টেশন জনসাধারণের অধিকারে এল। পুলিশ ষ্টেশনের সরকারী কর্মচারীরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। থানা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হল। সমস্ত সরকারী সম্পত্তি কাগজ পত্র ভস্মীভূত করা হল। পিছাবনির পি ডবলু ডি ব্রিজ ভেঙ্গে ফেলা হল। বহু জায়গায় ফেরিবোট ধ্বংস করা হল। সুদক্ষ নিয়মানুবর্ত্তিতায় বিশ হাজার বেঙ্গল ভলানটিয়ার মার্চ করে এগিয়ে চলল মহিষাদল পুলিশ থানা অধিকার করতে!

নেটিভদের দুঃসাহস দেখে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রাগে আগুন হয়ে লাঠি চার্জ করবার হুকুম দিলেন। পুলিশের নির্মম লাঠির আঘাত তাদের এক চুলও নড়াতে পারল না। মহিষাদল পুলিশ ষ্টেশন অধিকার করে তারা সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। মহিষাদল পুলিশ ষ্টেশনের আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্—তখন তার দলবল নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে! বুভুক্ষু জনসাধারণ তখন এগিয়ে চলল স্থানীয় চালকল অবরোধ করতে। এই ইচ্ছাকৃত দুর্ভিক্ষকে তারা প্রতিরোধ করতে চায়। তাদের ক্ষুধার অন্ন তারা নিজেরাই

জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে দেশবাসীকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাতে চায়। পুলিশের বেপরোয়া গুলিতে তিনজন নিহত ও আরও বহু লোক আহত হল। আবাল বৃদ্ধ বনিতায় জেলখানা গুলো ভরে গেল।

তারপর এল সেই স্মরনীয় দিন। ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা এগিয়ে এলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। তমলুক পুলিশ ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চলেছে মিছিল। মিছিলের পুরোভাগে জাতীয় পতাকা হাতে মাতঙ্গিনী হাজরা। বার্দ্ধক্য তাঁকে দুর্বল করতে পারেনি, জরা তাঁর অমিত তেজ ধ্বংস করতে পারেনি। মেরুদণ্ড সোজা করে অবিচল দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে চলেছেন তমলুক পুলিশ ষ্টেশনের দিকে। তাঁর পেছনে অগনিত নরনারীর মিছিল। পুলিশ ষ্টেশনের কাছাকাছি আসতেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ল জনতার ওপর। পুলিশ আর মিলিটারী তখন বেপরোয়া ভাবে অবিশ্রাম গুলি চালাচ্ছে নিরস্ত্র অহিংস জনতার ওপরে।

মিছিলের সঙ্গে এসেছে তের বছরের ছেলে লক্ষ্মীনারায়ন দাস। তার কাছে এ যেন একটা খেলা। যেন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলছে তারা। হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে সে একজন পুলিশের হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে রুখে দাঁড়াল!

—"মারছ কেন তোমরা? আমরা কি তোমাদের মেরেছি?" মুহূর্ত্তের জন্যে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল পুলিশটা তারপরই হিংস্র চিতার মতই ঝাঁপিয়ে পড়ল লক্ষ্মীনারায়ণের ওপর। দুপা ধরে শূন্যে তুলে ধোবার কাপড় কাচার মত আছড়াতে লাগল ইটপাথরে ভরা মাটির ওপর। ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে গেল লক্ষ্মীনারায়ণ, মুখ দিয়ে গলগল করে তাজা রক্ত পড়তে লাগল, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই পুলিশটার, আছড়াচ্ছে আর বলছে—"নে-নে দেশ স্বাধীন কর।"

মাতঙ্গিনী হাজরার কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। জাতীয় পতাকা উঁচু করে ধরে পুলিশ আর মিলিটারী ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে চলেছেন। বিস্মিত স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে সশস্ত্র পুলিশ আর মিলিটারী। শ্রদ্ধা

আর বিস্ময়ে তারা মুহূর্তের জন্যেও বুঝি বিচলিত হয়ে পড়েছে। গুলি করতে হবে তবু ওরা ট্রিগার টিপতে পারছে না। হাত যেন ওদের আড়ষ্ট হয়ে গেছে, পাথর হয়ে গেছে। কিন্তু সে ঐ মুহূর্তের জন্যই। পর মুহূর্তে এক ঝাঁক গুলি এসে পড়ল চারিদিক থেকে। প্রথম গুলি লাগল তাঁর হাতে, সেই রক্তঝরা হাতেই তিনি জাতীয় পতাকা ধরে রইলেন। তাঁর বজ্রকণ্ঠ আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—"নিরস্ত্র ভারতীয়দের ওপর কেন তোমরা অকারণ গুলি চালাচ্ছ। তোমরা যারা ভারতীয় তারা অস্ত্র ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দাও। বিদেশীর চাকরীতে পদাঘাত করে স্বাধীনতা আন্দোলনে তোমাদের নিজস্ব ভূমিকা গ্রহণ কর। দেশ শুধু আমাদের নয়, দেশ তোমাদেরও। দেশের সম্মান রাখবার দায়ীত্ব দেশের প্রতিটি মানুষের। তোমরাও এই দেশেরই মানুষ। তোমার দেশবাসীর ওপর এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও। বল বন্দে মাতরম্— । আর যারা ইংরেজ তারা মনে কর তোমার নিজের দেশের কথা। মনে কর একটা বিদেশী শক্তি তোমাদের স্বাধীনতা অপহরণ করেছে। মনে কর বিদেশীরা অপমানে, অত্যাচারে তোমাদের জর্জরিত করে তুলেছে—তারই প্রতিশোধ নিতে তোমরা এগিয়ে এসেছ। বলতে এসেছ—এ দেশ আমাদের—তোমরা বিদেশী তোমরা চলে যাও। এ দাবী আমাদের জন্মগত। বীর তোমরা, সভ্য তোমরা, বীরের মত একটা সভ্য জাতির প্রতি যেমন ব্যবহার করা উচিত তাই কর। মানুষকে হত্যা করে, মানুষের ওপর অত্যাচার করে তাদের রক্ত দিয়ে দেশের মাটি ভিজিয়ে কখন একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না"—কথা আর শেষ করতে পারলেন না মাতঙ্গিনী হাজরা ; এক ঝাঁক বুলেট তাঁর শরীরটাকে ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেল। একটি বুলেট তাঁর মাথা ভেদ করে বেরিয়ে গেল। তাঁর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তাঁর পবিত্র রক্তে দেশের মাটি ভিজে গেল। তখনও তাঁর বজ্রমুষ্টিতে ধরা ত্রিবর্ণ পতাকা

বাতাসে উড়ছে। একজন ব্রিটিশ সৈন্য ছুটে এল। বুটশুদ্ধ লাথি মারল—শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার গায়ে তারপর নির্মম পশুর মত তাঁর হাত মাড়িয়ে জাতীয় পতাকা মাটিতে ফেলে দিল।

আর একপাশে তখন পড়ে আছে আরও চারটি বালকের রক্তাক্ত মৃতদেহ। লক্ষীনারায়ণ দাস, পুরী মাধব প্রামাণিক, নগেন্দ্র নাথ সামন্ত আর জীবনচন্দ্র বেরা। গুলিবিদ্ধ আহত দেহগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে চারিদিকে পড়ে আছে। তারা যন্ত্রনায় আর্ত্তনাদ করছে, জলের জন্য কাতরোক্তি কবছে। পুলিশ আর মিলিটাবী ঘিরে রেখেছে জায়গাটা। কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না।

—"জল, ওগো একটু জল দাও"

মূমুর্ষুর আর্তনাদে স্থির থাকতে পারে না একটি মেয়ে। ছুটে গিয়ে জল নিয়ে আসে, অসীম সাহসে পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে ঢোকে। একসঙ্গে কয়েকটি রাইফেলের মুখ মেয়েটির দিকে ঘুরে যায়।

—'খবরদার—এক ফোটা জল দিলে গুলি করব।'

মেয়েটির ভ্রূক্ষেপ নেই—"গুলি করবে? বড় বাহাদুব সব! যাদের হাতে অস্ত্র নেই তাদের গুলি কবে খুব সুখ না? নির্লজ্জ, বেহায়ার দল, চেয়ে ছ্যাখ কি কবেছিস্ তোরা। আশী বছবের বৃদ্ধা আর বার বছরের ছেলেকে মেরে কিসের এত বড়াই করছিস্ তোবা। তোদের বন্দুকের ভয় আমি করিনে। গুলি করবি কর না, আমরা মেদিনীপুরের ছেলেমেয়ে কি গুলিতে ভয় পাই?" বলছে আর ক্ষিপ্র হাতে সবারই মুখে জল দিচ্ছে মেয়েটি।

কলকাতায় বোমা পড়ল পর পর দুদিন। বোমার ভয়ে তখন কলকাতার মানুষ পালাচ্ছে কলকাতাব বাইরে। কলকাতার আসে পাশে সহরতলীতে, বনে বাদারে যেখানে যত বাড়ী ছিল মানুষে ভরে গেল। এই সময় দেশে আরও একটা নোতুন বিপদ দেখা দিল। কিছুদিন থেকেই কাগজগুলো দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করছিল এবার সত্যি

সত্যিই তা বাস্তবে রূপ নিল। চালের দর হু হু করে বেড়ে চলল। পূর্ববঙ্গে চালের দর আশি টাকা মনে উঠে গেল। না খেতে পেয়ে মানুষ মরতে শুরু করল। কাতারে কাতারে আবাল বৃদ্ধ বনিতা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে শুরু করল খাদ্যের সন্ধানে। রাস্তায়, ফুটপাথে, পার্কে, ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে, বনে বাদাড়ে এই সব দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ এসে জমায়েত হোল। কোমরে একটুকরো কাপড়, মাথায় রুক্ষ জটবাধা শুকনো চুল, ব্ল্যাক আউটের আলোর মত কোটরগত উজ্জ্বল ধ্বক ধ্বকে চোখ। দেখলে শিউরে উঠতে হয়। হাঁপানী রুগীর মত টানা ক্ষীণস্বরে তারা শুধু আর্ত্তনাদ করছে—"মা গো একটু ফ্যান দাও।" মিলিটারীর লোকেরা ওদের দেখলেই ট্রাক ভরতি করে লোকালয়ের বাইরে একেবারে মৃত্যুর দোরগোড়ায় বসিয়ে দিয়ে আসছে। ভিক্ষে করে প্রাণ বাঁচাবার উপায়ও ওদের নেই। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় লুপ্ত হতে চলেছে। যুবতী মেয়েরা প্রাণের দায়ে দেহের বেসাতি করতে বাধ্য হচ্ছে। বড় লোকেরা আরও অর্থবান হচ্ছে, গরীবরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ কালোবাজারে মুনাফা লুটে ফেঁপে ফুলে উঠছে। দুটো জিনিষ তখন হু হু করে বেড়ে চলেছে—একদিকে কালোবাজারী আর একদিকে দুর্ভিক্ষ।

মহাযুদ্ধের আবহাওয়ায়, মৃত্যুর মহাযজ্ঞের মধ্যে মানুষের মন তখন জীবনের স্থিরতা সম্বন্ধে সন্দিহান। দুদিন বইতো নয় সে যত টুকু পার ভোগ করে নাও। কখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসবে কিছু বলা যায় না। ঘুষ নাও, কালোবাজারী কর, মানুষের মুখের অন্ন গুদামে ভরে তালাচাবি লাগিয়ে দাও। আজকের দিনে পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই। মানুষের ক্ষিদে বাড়তে দাও, আয়ও বাড়তে দাও, মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পড়ুক দেশ। একের জায়গায় তখন মানুষ দশ দেবে, বিশ দেবে, পঞ্চাশ দেবে, না দিয়ে যাবে কোথায়। মিলিটারী কনট্র্যাকট নাও। সেপাইদের পেট ভরাবার জন্যে চতুর্গুন দাম নিয়ে গভর্ণমেন্ট

সব খাদ্য সামগ্রী কিনে নেবে। টাকার অভাব নেই। বড় বড় অঙ্কের নোট ছাপিয়ে বাজারে ছেড়ে দাও, কালোবাজার কে আবও কালো কর। আব্রু বাঁচাতে কালো বোরখায় গোটা দেশটা ঢেকে দাও।

পাপ প্রথম আসে প্রচ্ছন্ন ভাবে চোরের মত তারপব রূপ নেয় স্পষ্ট ঔদ্ধত্যে। পুরুষ চির অতৃপ্ত। ধ্বংসই তার ধর্ম, সিনিজম তার বেদ। মিলিটারীদের জন্যে একটা বিভাগ খোলা হোল তার নাম ওয়াকাই, W.A.C.I. পুরুষরা ধ্বংস করবে আর তাদের পাশে বসে দেশের সুন্দরী যুবতীরা তাদেব মনোরঞ্জন করবে। পুরুষের ভোগের জন্যই তো নাবী সৃষ্টি করেছেন ভগবান। সেই প্রাগ ঐতিহাসিক যুগ থেকেই তো এই একই নিয়ম চলে আসছে। মোগল বাদসাবা পৃথিবী জুড়ে সুন্দরী মেয়ে এনে হারেমে জড়ো করত ভোগ করবাব জন্যে। যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তাদের সঙ্গে নিত। নাবীও পুরুষের খাদ্য সামগ্রী। টাকা দাও, গয়না দাও, সাড়ী দাও, সুরা পাণ করিয়ে ওদের মাতোয়ালী করে তোল, আর ভোগ কব আপন খুসী মত—।

মানুষ নাকি দেবতার মূর্ত্তিতে গড়া। বিভীষিকাব কত অনন্ত রূপই না ধবতে পারে এই দেবরূপী দানব ?

এগার

গৌরী তার পড়ার ঘরে বসে বসে গুণগুণ করে গান গাইছে— 'শাসন সংযত কণ্ঠ জননী গাহিতে পারি না গান'। 'বরেন মুখুজ্যে নিঃশব্দে মেয়ের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বিভোর হয়ে শুনছেন গান। একসময় গান থামিয়ে উঠে দাঁড়াতেই বাবাকে দেখে অবাক হয়ে গেল গৌরী।

—"বাবা! কিছু বলবে? আমায় ডাকলেই তো পারতে?

—"নারে, কিছু বলতে আসিনি। তুই গান গাইছিলি ভাল

আগল তাই দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। এসব গান কার কাছে শিখলে ?

—"ভাস্করদার কাছে, বাবা।"

—"সত্যপণ্ডিতের ছেলে ভাস্কর ? ও বুঝি আজকাল খুব স্বদেশী করে ?"

বাবার মুখের দিকে একবার চাইল গৌরী, তারপর মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলল—ওসব আমি জানিনে বাবা।'

মেয়ের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন বরেন মুখুজ্যে।

—"পুলিশের খাতায় ওর নাম আছে। ওকে একটু সাবধানে থাকতে বলিস্। ওর বাবা মা মেয়েটাকে নিয়ে দেশের বাড়িতে পড়ে আছেন। মেয়েটারও তো বিয়ে দিতে হবে সব দিক ভেবে ও যেন কাজ করে। তা হ্যাঁ রে তোরা কলেজে তো ও সব হুজুগে মাতামাতি করছিস্ নে ? শংকরটাকে একটু সামলে রাখিস্—"

—তুমি অত ভেব না বাবা। দেশের যা অবস্থা হয়েছে ঘরে বসে থাকলেই কি বিপদকে এড়ানো যাবে ? পথে বেরুলেই তো বিপদ। সেদিন শুনলে না, কুলীরা রেলের লাইনে কাজ করছে, ওপর থেকে মেশিনগান চালিয়ে সব কটাকে খতম করে দিল। ওরা তো আর স্বদেশী করেনি।" —গৌরী সেই ছোট বেলার মতই বাবার গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। —"বাবা এই চেয়ারটায় বস আমি তোমার পাকা চুল বেছে দি।"

—"না রে বসবার সময় নেই। বেরুতে হবে এখনি। শ্যাম-বাজারে ডিউটি পড়েছে।" কথাটাবলেও চেয়ারটায় বসে পড়লেন বরেন মুখুজ্যে। গৌরী পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁচা চুল সরিয়ে সরিয়ে পাকা চুল বাছতে বাছতে বলল-তোমার মাথায় কি সুন্দর কোঁকড়া কোঁকড়া চুল বাবা। সবই তো কাঁচা, এই যে একটা পেয়েছি"— চুলটা তুলে বাবাকে দেখায় গৌরী।

—"তা হ্যাঁরে গৌরী তোদের কলেজে কিছু হচ্ছে না ?"

—"ওমা হচ্ছে না আবার। কলেজে কি আজকাল পড়াশোনা

হয় ? অন্য কলেজের ছেলেরা এসে বাইরে শ্লোগান দেয়, ওদের সঙ্গে যোগ দিতে বলে। মেয়েরাও বেরিয়ে পড়ে। কাল তো আমাদের ফোর্থ ইয়ারের ভক্তি দি'কে ধরে নিয়ে গেল। বাবা, তুমিও কিন্তু সাবধানে চলা ফেরা করো। জান তো, দেশের লোকের তোমাদের ওপরই বেশি রাগ।"

বরেন মুখুজ্যে হাসলেন একটু।

—"তুমি এমন চাকরী ছেড়ে দিলেই তো পার বাবা।"

—"তারপর তোদের কি হবে ? তোদের পড়াশোনা, খাওয়া পরা ?"

—"সে তখন দেখা যাবে।"

দূর্গা এসে ঘরে ঢুকলেন।

ওমা তুমি এখনও বসে আছ ? এরপর নাওয়া খাওয়া না করেই তো বেরিয়ে যাবে। গৌরী যা তো মা তোর বাবার জিনিসগুলো স্নানের ঘরে রেখে আয়।"

গৌরী বেরিয়ে যেতেই দুর্গা এসে বরেন মুখুজ্যের পাশে দাঁড়ালেন—

—"তোমার কি হয়েছে বলতো ? কদিন থেকেই দেখছি, চিন্তায় ভাবনায় তোমার চোখে মুখে কালি পড়ে যাচ্ছে। কি এত ভাবছ দিনরাত ?"

—"দেখছো তো কলকাতার অবস্থা. ছেলে মেয়ে দুটো কলেজে যাচ্ছে কখন যে কি হবে কে জানে ?"

—"তাই বলে কি হবে সেই ভাবনায় তুমি এমন করে নাওয়া খাওয়া বন্ধ করবে। ভগবান যা করবেন তাই হবে। ওঠো তো তুমি"—একরকম জোর করেই দূর্গা স্বামীকে স্নানের ঘরে পাঠিয়ে দেন।

তা ভাবনা হবার মতই দিনকাল তখন। সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলনে। বিরাট তার অবদান, বিরাট তার পটভূমিকা। আক্রমণ আর পালটা আক্রমণ।

চিবকাল মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করতে আর মার খেতে ভারতবাসী আর রাজী নয়। অহিংসার নামে নেতিবাদকে তারা মানে না মানবে না। সুতরাং আঘাতের বদলে আঘাত তারা হানবেই। 'লাইফ ফর লাইফ,' 'ব্লাড ফর ব্লাড' 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গা' 'ডু অর ডাই' 'কুইট ইণ্ডিয়া'।

আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার সর্বত্র। হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান বোলপুর, বালুরঘাট, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, যশোর—সব জায়গাতে একই অবস্থা। স্কুল কলেজ বন্ধ, ছেলেমেয়েরা জাতীয় পতাকা হাতে সহর প্রদক্ষিণ করছে আর বলছে 'কুইট ইণ্ডিয়া'—

লেটার বক্স, ফায়ার এলার্ম, ইলেকট্রিক ফিউজ বক্স, পোষ্টাফিস একটার পর একটা সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে জনসাধারণের হাতে। সশস্ত্র মিলিটারী পুলিশ বোঝাই গাড়ীর ওপরও তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। —'ডু অর ডাই'—'করেঙ্গে ইয়ে মবেঙ্গে'।

ভোর না হতেই দলে দলে প্রভাত ফেরী পথে বেরিয়েছে—

"বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও
তোমরা এখনো ঘুমাও"

সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। আন্দোলনের কোনও কথা প্রকাশ করা চলবে না। আন্দোলন সুরু হয়েছে স্বাধীনতা প্রয়াসী দুটি দলের মধ্যে—অহিংসা আর সংগ্রাম।

একদিকে মহাত্মা গান্ধী অন্য দিকে মহম্মদ আলি জিন্না। দুজনেই কুটনীতিতে অদ্বিতীয়। ১৬ থেকে ২০ আগষ্ট বম্বেতে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে জিন্না সাহেব ঘোষণা করলেন হিন্দু নেতা গান্ধীর এই আন্দোলনের দুইটি উদ্দেশ্য—এক, বিপদগ্রস্ত ইংরেজকে ভয় দেখিয়ে কংগ্রেসের দাবী মেনে নিতে বাধ্য করা দুই ; সেই দাবীর জোরে মুসলিম সমাজকে ধ্বংস ক...

খবর শুনে তৎপর হয়ে উঠলেন সুভাষ। এই তো অপূর্ব সুযোগ।

খোলা হ'ল ইণ্ডিয়ান ন্যাশানল কংগ্রেস রেডিও—আজাদ হিন্দ রেডিও জিন্না সাহেবের এই অপপ্রচারের প্রতিবাদে আজাদ মুসলিম রেডিও থেকে মুসলিম সমাজকে সজাগ করে দেওয়া হল—

—'তোমরা এসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ো না—স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। এই মুক্তি সংগ্রামে সবাই এসে দলে দলে যোগ দাও। ভারতবর্ষ শুধু হিন্দুর নয়, শুধু মুসলমানেরও নয়, মিলিত হিন্দু মুসলমানের স্বপ্নের ভারতকে তোমরা পরস্পর মিলিত হয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত কর।'

আর একদিকে চৌরীচোরা ও বড়দৌলী গণবিক্ষোভে গান্ধীজী বিরক্ত হয়ে তাঁর আন্দোলন বন্ধ করলেন। তখন সব জায়গায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অপূর্ব গণসমর্থন আর উদ্দীপনা। এমন একটি ব্যাপক এবং গভীর আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনায় সারা বাংলা তখন /স্তম্ভিত।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী কলকাতা তখন প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ট্রাম সার্ভিস বন্ধ। ট্রলি রোপ কেটে দিয়ে ট্রাম সার্ভিসকে বিপর্য্যস্ত করা হয়েছে। রাস্তার মাঝখানে ডাষ্টবিন আর ঠেলাগাড়ী দিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে যার ফলে মিলিটারী আর পুলিশ ভ্যানের চলাফেরা করা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পোষ্ট বক্স, ইলেকট্রিক ফিউজ বক্স, ফায়ার এলার্ম উপড়ে নিয়ে রাস্তার ওপর ফেলে দেওয়া হয়েছে। মিলিটারী ভ্যান আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। পুলিশের লাঠি চার্জ, মিলিটারীর গুলি কোন কিছুতেই তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ইউরোপীয় পোষাকপরা কেউ সামনে এলে তার আর রক্ষে নেই। তাদের কোট প্যান্ট, টুপি, নেকটাই সব আগুনে আহুতি।

এতখানি গণ অভ্যুত্থান ভারতের ইতিহাসে আর কখনও হয়নি।

এদিকে মেদিনীপুরকে জব্দ করবার জন্যে ব্রিটিশ আর পাঠান সেনাবাহিনী নিয়ে আসা হল। তাদের ওপর ঢালা হুকুম দেওয়া হল 'তোমরা যা খুসী অত্যাচার কর'। ওধারে মুসলমানদের উৎসাহ

দেওয়া হল হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করলে ইনাম মিলবে। তারপর সুরু হল মেদিনীপুরে সেই ঐতিহাসিক ব্রিটিশ নির্য্যাতন। হিন্দুদের ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল, তাদের সম্পত্তি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হল, লুঠ করে নেওয়া হল তাদের যথাসর্ব্বস্ব। মেয়েদের ওপর সুরু হল অমানুষিক অত্যাচার। এই অত্যাচারেব কবলে পড়ল মেদিনীপুরের মেয়ে ভারতী।

প্রকৃতিও যেন এই অত্যাচারের সঙ্গে তাল দিয়ে চলেছিল। প্রচণ্ড এক ঘুর্ণিবার্ত্তা আছড়ে পড়ল মেদিনীপুরের বুকে। অবিরাম বৃষ্টিতে মেদিনীপুর ভেসে গেল। জলের তোড়ে ভেসে গেল বহু নারী পুরুষ আর শিশু। কেউ কাউকে এতটুকু সাহায্য পর্যন্ত করতে পারল না। সরকারী সাহায্যের অভাবে তাদের একজনকেও বাঁচানো গেল না। এমনি এক দুর্য্যোগের রাতে ভারতীদের বাড়ীতে হানাদিল একদল সশস্ত্র গোরা সৈন্য। বন্দুকের কুঁদোব আঘাতে ভারতীর বাবা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, ভারতীর মা বাধা দিতে এলে তাকেও প্রচণ্ড আঘাতে ভূমিশয্যা নিতে হল। ভারতী তখন বাড়ীর পেছন দরজা দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। পায়ের নীচে জলের তোড় মাথার ওপর অশান্ত বর্ষন তারই মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে ভারতী। সঞ্জয় সেনের পাড়ার মেয়ে ভারতী।

—"সঞ্জয়দা, বাঁচাও—সঞ্জয়দা তুমি কোথায়? ওরা যে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, এবারে যে ওরা আমায় ধরে ফেলবে আমি যে আর ছুটতে পারছি নে"—হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল ভারতী। আর চীৎকাব করতে পারেনি ও। কতগুলো অন্ধকার ছায়া ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওর ওপর।

ওর যখন জ্ঞান হল তখন সকাল হয়ে গেছে। রাস্তার পাশে জলকাদার মধ্যে পড়ে আছে ও। জলকাদা থেকে কয়েকবার উঠবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। ওব সর্বাঙ্গে পুরু কাদার প্রলেপ। এ অবস্থায় ওকে দেখলে কেউ চিনতে পারবে না। অসাড় হয়ে পড়েই

থাকে ভারতী, এমনি করে একসময় বেলা বাড়ে। হঠাৎ ওর মনে হয় কে যেন ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। ভয়ে ও আর্ত্তনাদ করে ওঠে—"সঞ্জয়দা বাঁচাও।"

—"তুমি ভারতী" ?

—"সঞ্জয়দা ত,মি এসেছ"—উচ্ছ্বসিত আবেগে কেঁদে উঠল ভাবতী।

—'আমি এইমাত্র ফিরছি সহরে ঢুকবার সাঁকোটাকে শেষ করে।' তোমার এমন অবস্থা কেমন করে হোল ভারতী ?

ভারতী কোন কথা বলে না। প্রাণহীন পাথরের মূর্ত্তির মত চেয়ে থাকে সঞ্জয়ের মুখের দিকে। ওর ঠোঁটছুটো অব্যক্ত বেদনায় থরথর করে কাঁপে।

পরদিন।

—"আমিও তোমার সঙ্গে যাবো—সঞ্জয়দা—"

—"চল"—। আজ প্রতিহিংসার দিন। মারের বদলে মার, হিংসার বদলে হিংসা ; অত্যাচারের বদলে অত্যাচার। আজ আমরা প্রমাণ করে দেব এত অত্যাচারের পরও মেদিনীপুর মরেনি। এদেশ আমাদের। আমরাই এ দেশেব মালিক। বিদেশীদের কোন আইন আমরা মানি নে। 'ডু অব ডাই, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'

—'বল রে বন্য হিংস্র বীর
তুঃশাসনের চাই রুধির
চাই রুধির রক্ত চাই
ঘোষ দিকে দিকে এই কথাই
তুঃশাসনের রক্ত চাই তুঃশাসনের রক্ত চাই।'

সদর্পে এগিয়ে চলেছে বাংলার অশান্ত যৌবন। ভাঙ্গ—ভাঙ্গ—সব ভেঙ্গে চুরমার করে ফেল। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের নিদর্শন যা কিছু সামনে পড়বে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দে। পথের মাঝে মাঝে কোদাল আর শাবলের সাহায্যে বিরাট বিরাট পরিখা খোঁড়া হল।

বড় বড় গাছ কেটে পথের মাঝখানে ফেলে রাস্তা বন্ধ করা হল। নদীর সাঁকো ভেঙ্গে সহরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হল। জনতার রোষে সরকারী অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড, পোষ্টাফিস, থানা পুড়ে ছাই হল। জনতার আক্রোশ শতধারায় ফেটে পড়ল পটাশপুর, খেজুড়ি আর ভগবানপুর থানার ওপর। 'গো ব্যাক ব্রিটিশ—কুইট ইণ্ডিয়া—'

বাধা দিল পুলিশ। আর এক পা এগুলে গুলি করা হবে।

—"গুলি করবে?" বিদ্রূপেব হাসিতে ফেটে পড়ল ভাবতী "তবে তাই কর, বল বন্দেমাতরম"। সবাই মরবার জন্য প্রস্তুত। জনতার ওপর নির্মম লাঠি চার্জ করা হল। প্রাণ দিতে হল যামিনীকান্ত কামিলা, অনন্ত কুমার পাত্র, সঞ্জয় সেন, ভারতী আরও অনেককে।

প্রথম পদত্যাগ কবলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পরে ফজলুল হক্। কারণ মেদিনীপুর।

গান্ধিজী এগিয়ে এলেন আপোষ মীমাংসায়। ছোট্ট একটি সর্ত্ত। বিনা বিচারে কারারুদ্ধ বন্দীদের শুধু বলতে হবে—'আমরা আর হিংসার পথে পা বাড়াবো না।' সব বৃথা—গান্ধীজীব প্রস্তাবকে কেউ স্বীকার করল না—কোন রকম সর্ত্ত নয়, প্রতিশ্রুতি নয়—আগে মুক্তি পবে অন্যকথা।

বারো

আজকের মানুষের জীবনের গতি বদলে গেছে। সেদিনের মত ছেলেমেয়েদের আজকের দিনে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আজকের দিনে ছেলেমেয়েদের কাছে এসব যেন বানানো রূপকথার গল্প।

—"ছ্যাৎ শালা, এসব গ্যাঁজা তোরা বিশ্বেস করিস্। কি কার-বার মাইরি"—ফটকে খানিকটা বিমূঢ়! হয়ে যায়। বলে অ্যাই—অ্যাই সব কথাতেই তোদের খচড়ামী।"

মদনা সিগারেটের খানিকটা ধোঁয়া ফটকের মুখের ওপর ছুঁড়ে

দিয়ে মিঠে করে একটা শিস্ দেয়।

—"শ্লার দেশপ্রেম জন্মেছে রে রতনা। আরে অমন পালে পালে দেশপ্রেমিকা পেলে আমরাও রাতারাতি দেশপ্রেমিক হয়ে উঠতে পারি।"

—"যা বলেছিস্ মাইরী—"

স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের জীবনকে ভাল করে জেনে যাবার সুযোগ পায়নি ভাস্কর। হাসপাতালে রোগ শয্যায় শুয়ে শুয়ে সুপর্ণাকে নানা প্রশ্ন করেছে কখনও উত্তর পেয়েছে, কখনও পায়নি। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা জীবন উৎসর্গ করেছে স্বাধীনতার জন্য যারা নিজেদের জীবনকে অন্যায় অত্যাচারে জর্জ্জরিত করে আজ শেষ-দিনের প্রহর গুনছে তাদের জন্য স্বাধীন ভারত কতটুকু কর্ত্তব্য পালন করেছে সেটুকুও জানবার সুযোগ পায়নি ভাস্কর।

সেদিন হাসপাতালে ভাস্কর সুপর্ণাকে বলল—'সুপ্রিয়র চিঠিখানা* আমায় দেখালে না তো গৌরী?

—"কি হবে এখন ও চিঠি দেখে? যা চুকে বুকে গ্যাছে তা আবার নতুন করে ঝালাতে গিয়ে শুধু কষ্টই বাড়বে যা তুমি অসুস্থ শরীরে সহ্য করতে পারবে না—! তাছাড়া ওটা তো ঠিক চিঠি নয়, কতকটা ডায়েরীর মত। আপন খেয়ালে বসে বসে সুপ্রিয়দা লিখেছিলেন।"

—"তা হোক গৌরী—তুমি জান না আমার সহ্য করবার শক্তি কতখানি বেড়ে গেছে। আজ মনে হয় চন্দ্রদা, আর লালদি যদি ও ভাবে স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ না করতেন তা হলে তাঁদের ওপব কী নির্মম অত্যাচারই না করা হত।"

—"আমিও জেলে দেখেছি মেয়ে বলে ওদের কোনও পক্ষপাতীত্ব ছিল না। চড়, ঘুঁসি, বেটনের ঘা, বুটের লাথি এসব তো ওদের কাছে ভদ্র অত্যাচার।"

—"প্রথম দিন আমার যখন জেলের সেলের মধ্যে জ্ঞান হ'ল, ওরা

প্রথমে আমায় নানা প্রলোভন দেখিয়ে দলের খবর জানার চেষ্টা করল। বল—'চন্দ্র দে এতদিন কোথায় ছিল? তোমার সঙ্গে তার কতদিনের পরিচয়? সুভাষ বোসের পালিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে তুমি কি জান'—এমনি শত সহস্র প্রশ্নে প্রশ্নে আমায় উত্যক্ত করতে আরম্ভ করল। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম—'তোমাদের এত প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই সায়েব, তবে একটা এ্যাড্‌ভাইস তোমাদের দিতে পারি এবারে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও—আমাদের দেশে বসে আমাদেরই ওপর অযথা অত্যাচার করোনা। আমার এতখানি ঔদ্ধত্য সাহেবের সহ্য হল না, সে বুটশুদ্ধ আমায় লাথি মারল। অসহ্য অপমান আর দৈহিক অত্যাচার চলল। তারপর আমায় 'টরচার রুমে' পাঠিয়ে দেওয়া হল।"

গৌরীর চোখ ভরে জল এসে গিয়েছিল। আঁচলে চোখ মুছে বলল, 'আমি তা হলে সুপ্রিয়দার চিঠি খানা পড়ে যাচ্ছি তুমি শুয়ে শুয়ে শোন।'

চিঠি তো নয় যেন একটা গল্প।

"আমাদের নৌকো পদ্মার স্রোতের টানে ভেসে চলছে হু হু করে। পদ্মাব তীব্র স্রোতে তীর থেকে ক্রমাগত ঝুপ ঝুপ করে মাটি খসে পড়ছে। এতবড় নদীটার মধ্যে তখন আর কোন নৌকো দেখা যাচ্ছে না। চারিদিকের জল ক্রমাগত ছলছল কলকল শব্দ করছে। বাতাসের হু হু শব্দ শোনা যাচ্ছে। নদীর ওপারে, মাঠের ওপরে, আশে পাশের গ্রামের ওপরে রাতের অন্ধকার নেমে গাঢ় হয়ে আসছে। সুপ্রিয় নামে চব্বিশ বছরের ছেলেটি মমতা নামে সতের বছরের একটি মেয়ের জন্যে তার অদৃশ্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে 'হে ঈশ্বর তুমি মমতাকে আশ্রয় দাও, ও যেন সুখ পায়,ও যেন শান্তি পায়। মানুষের হাতে গড়া পাপ আর পঙ্কিলতা থেকে ও যেন দূবে চলে যেতে পারে।

বাড়ী থেকেই মমতাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল অবিনাশ দারোগা।

ওর অপরাধ ওর দাদা ভাস্কর সন্ত্রাস বাদী নেতা চন্দ্র দে'র সঙ্গে একই বাড়ীতে রিভলভাব হাতে ধরা পড়েছে। চন্দ্র দে আর তার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে সে রিভলভারের গুলি ছুঁড়েছে। মেয়েকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সত্য পণ্ডিত হাহাকার করে উঠলেন—ওর কি অপরাধ? ও তো কোনদিন ঘরের বাইরেও যায়নি ও তো কোনদিন স্বদেশী করেনি, তবে কেন ওকে থানায় যেতে হবে?"

—"ওসব আমরা জানিনে, আমরা হুকুমের চাকর, হুকুম তামিল করতে এসেছি।"

—"অবিনাশ বাবু! আপনি তো আমারই মত বাঙ্গলা দেশের মানুষ, আপনি তো বিদেশী নন, আপনার ঘরেও স্ত্রী আছে, মা বোন আছে এই মেয়েটিকে রক্ষা করার দায়ীত্ব আপনারও তো কম নয়।"

—"আমরা কি করব বলুন? আমাদেরও তো ঘর সংসার আছে। আপনাব জন্যে তো আমি চাকরী খোয়াতে পারিনে।"

চাকরী খোয়াবার ভয়েই বোধহয় সেদিন মমতাকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ওদের চাকরী কোনদিন যায় না। অন্যের সর্ব্বস্বের বিনিময়ে চিরদিনই ওরা এমনি করে নিজেদের চাকরী বজায় রাখে। কিন্তু সত্য পণ্ডিত যা হারালেন তা আর তিনি ফিবে পেলেন না কোনদিন।

সেদিন রাতে একটু দেবী করেই আমি বাড়ী ফিরেছিলাম। মমতার সঙ্গে আমার বিয়ের আর ক এক দিন মাত্র দেরী আছে। দুই বাড়ীতেই বিয়ের সামান্য আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। সেদিনও সকালে খিড়কির ঘাটে আমার সঙ্গে মমতার দেখা হয়েছে। ছোট বেলার মতই ও জিব ভেঙ্গিয়ে বলেছিল—'চোর কোথাকার, বিয়ের আগে দেখা করতে মানা না?' আমি হেসে উত্তর দিয়েছিলাম—'সে তো আইবুড়ো ভাত খাবার পর।" কে জানত সেই দেখাই হবে আমাদের শেষ দেখা। সে দিন সন্ধ্যা থেকেই অশান্ত বর্ষণ সুরু হয়েছিল। বিয়ের কিছু কেনাকাটা করতেই আমায় বাইরে যেতে

হয়েছিল। মার কাছে খবরটা শুনেই ছুটলাম মমতাদের বাড়ীতে। ওর বাবা আর্ত্তনাদ করে কেঁদে উঠলেন আমাকে দেখে। 'আমার মমতাকে ফিরিয়ে এনে দাও বাবা। ওকে অবিনাশ দারোগা জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।' ওখান থেকে ছুটলাম অবিনাশ দারোগার বাড়ীতে। অবিনাশ দারোগার ভাই নিখিলেশ এসে দরজা খুলে দিল। আমায় দেখে অবিনাশ দারোগার স্ত্রী আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'অনেক দেরী করে ফেলেছ সুপ্রিয়—তবু ছুটে যাও পুলিশ ব্যারাকের দিকে। ওখানেই মমতাকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা।' আমি চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই তিনি আমার হাতে কাগজে জড়ানো একটা শক্ত জিনিষ গুঁজে দিয়ে বললেন—এটা নিয়ে যাও' লোড করা আছে, একটা চামড়ার ব্যাগে গুলিও আছে। খালি হাতে ওখানে গিয়ে কোন লাভ নেই।' অবিনাশ দারোগার স্ত্রীর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরে পড়ছিল।

আশ্চর্য হবার সময় পাইনি, ধন্যবাদ জানাবারও সময় পাইনি। ছুটে গিয়েছিলাম পুলিশ ব্যাবেকের দিকে। পুলিশ ব্যারাক নিস্তব্ধ। কোথাও কোন মানুষের সাড়া নেই। তখনও মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। হঠাৎ বিদ্যুতের আলোতে মনে হল পুলিশ ব্যারাকের সামনে রাস্তার ওপর একটা কিছু পড়ে আছে। ওখানেই বসে পড়লাম আমি। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মমতা। ওর সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ কাদায় মাখামাখি। আমার পরণের কাপড়ের অর্দ্ধেক ছিঁড়ে ওকে জড়িয়ে কোলে তুলে নিয়ে যখন মমতাদেব বাড়ী এসে পৌঁছলাম তখন রাত শেষ হতে আর দেরী নেই।

এর পরের ঘটনা বিন্যাস করে আর কোন লাভ নেই। সত্য পণ্ডিত আর তার স্ত্রী চীৎকার করে কাঁদেন নি। একটি মাত্র ছেলে খুনের দায়ে জেলে, একটি মাত্র মেয়ের এই অস্বাভাবিক মৃত্যু তাদের পাথর করে দিয়েছিল। শ্মশান থেকে মমতার বাবা যখন ফিরে এলেন তখন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন জীবনের কোনও স্পন্দন

নেই তাঁর। ঘটনা এইখানেই শেষ হয়নি। বাড়ী ফিরেই জানা গেল শোবার ঘরে কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে মমতার মা আত্মহত্যা করেছেন।

এর পরের ঘটনা আরও সংক্ষিপ্ত। প্রতিশোধ নেওয়া। অবিনাশ দারোগাকে নির্মম ভাবে হত্যা করে মমতার মৃত্যুব প্রতিশোধ নেওয়া। আমি প্রস্তুত ছিলাম আমাদের বহুকালের পরিচিত ছিদাম মাঝি ছিল আমার সহায়। সে তার নৌকো নিয়ে ইছামতীর ধারে তেঁতুলতলার ঘাটে—আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমায় নিয়ে সে পালিয়ে যাবে অনেক দূরে। আমার সহায় ছিল অবিনাশ দারোগার স্ত্রীর দেওয়া রিভলবার। অবিনাশ ঘোষালের সন্ধ্যার আসর কোথায় বসে আমার জানা ছিল। রাধা বষ্ঠ্‌মীর আখড়ার ঝাকড়া আমগাছটার আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। একটু টলতে টলতেই আসছিলেন অবিনাশ দারোগা। আমি অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ওকে অনুসবণ করলাম। তেঁতুলতলার ঘাটের পথ দিয়েই ওকে যেতে হবে। তেঁতুলতলা একটা নির্জন পরিত্যক্ত ঘাট। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মারা গেলে ওখানে মাটি দেওয়া হয়। দিনেব বেলাতেও ও রাস্তা দিয়ে বিশেষ প্রয়োজন না হলে লোক চলে না, রাত্রে জনপ্রাণীর চিহ্ন থাকে না। 'হরিনাম, শুনতে এই বিপদ সঙ্কুল পথ দিয়েই অবিনাশ দারোগা প্রায় রোজই যাতায়াত করতেন। এসময়ে তার কোমরে জামাব নীচে ঝোলান থাকত হাতীর দাঁতের বাট লাগানো তার নিজস্ব ছোট্ট রিভলবারটা। সরকারী বড় রিভলবারটা তিনি অফিসের প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করতেন না।

কিন্তু রিভলবাব বার করবার সুযোগ তিনি পান নি, তার আগেই আমার হাতের পর পর চারটে গুলিতে ·রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে হয়েছিল অবিনাশ দারোগাকে। অবিনাশ দারোগার শরীরটা তখন কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছিল। প্রবল ঝাঁকুনী খাওয়ার মত অবিনাশ

দারোগার দেহটা আর একবার কেঁপে উঠল তারপর সব স্থির। ইছামতীর ঘাটে কলাগাছের একটা ভেলা বাঁধাই ছিল। অবিনাশ দারোগাব দেহটা ছেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে তার ওপর বেঁধে দিলাম। লালকালিতে লেখা "মমতার মৃত্যুব বদলা"—কাগজখানা সেঁটে দিলাম ওর বুকের ওপর জামার সঙ্গে। তারপর ভেলা ঠেলে নিয়ে ভাসিয়ে দিলাম স্রোতেব মুখে। এতক্ষণে একটা নিশ্চিন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাতের রিভলবারটা ইছামতীব জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুক্তিস্নান সেরে ছিদাম মাঝিব নৌকোয় উঠে বসলাম।

সুপ্রিয় নামেব সেই ছেলেটি তখনও ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে—'মমতাকে শান্তি দাও—তাকে অশান্তিব বাজ্য থেকে আনন্দ লোকে নিয়ে যাও।' স্রোতের টানে ভেসে চলেছে আমাদের নৌকো। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। ছিদাম মাঝি হাল ধবে বসে আছে। মাঝে মাঝে থেমে থেমে গাইছে

—'মাঝি তোর বৈঠা নে রে

আমি আর বইতে পারলাম না।'—

এখান থেকেই বুঝতে পারছি ছিদামদা কাঁদছে। আমায় ও বাঁচাতে চায় কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

জন্ম থেকে যে জীবন সুরু হয় মৃত্যুতেই কি তাব পূর্ণচ্ছেদ? কিন্তু মানুষের পৃথিবীতে তো মৃত্যু নেই। মানুষের আজকের জীবন কি একটি মহাজীবনেব মালা থেকে খসে পড়া একটি ফুল নয়? হঠাৎ সুপ্রিয়র মনে হয় পদ্মার বড় বড় ঢেউ-এর ওপর পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে অবগুণ্ঠনে ঢাকা একটি নারীমূর্তি। সুপ্রিয়র শিরায় শিরায় উদ্বেগের চঞ্চলতা, একটা আবেগের শিহরণ। চারিদিকে একটা শূন্য রিক্ত দীর্ঘশ্বাস পাগলা হাওয়ার মত হা হা করে ওঠে। অবগুণ্ঠনে ঢাকা নারীমূর্তি এসে দাঁড়ায় সুপ্রিয়র সামনে। দমকা হাওয়ায় খসে পড়ে ওর মুখের আবরণ। ওর চোখের কোনে অবসাদের ঘন কালিমা। ওর অতল ডাগর চোখে ঝিকমিকিয়ে উঠেছে অশ্রুর

মুক্তা বিন্দু। এলোমেলো হাওয়ায় ওর খোলা চুল উড়ছে। কুহকী রাতে যেন এক অতীত যুগের নায়িকা কোন এক জন্মান্তরের বীজ বহন করে এসে দাঁড়িয়েছে সুপ্রিয়র সামনে।

—"মমতা, তুমি !"

—"আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি সুপ্রিয়দা।"

তারপর রাত শেষ হবে। পূব আকাশে সূর্য্য উঠবে। ক্রমে বেলা বাড়বে, ছিদাম মাঝি হয়ত সুপ্রিয়কে ডাকবে—"আর কত ঘুমাও দাদাবাবু বেলা যে তেপহর হতে চলল। নাও এবারে উঠে মুখে কিছু দাও। তোমার জন্যি বেগুন সেদ্ধ দিয়ে ফ্যানা ভাত রান্না করেছি।" তবু সুপ্রিয়ব ঘুম ভাঙ্গবে না। ছিদাম মাঝি আবার ডাকবে - 'ওঠ গো দাদামনি ! না খেয়ে পড়ে থাকলেই কি মমতা দিদি ফিরে আসবে ? কিন্তু ছিদাম মাঝি তখনও জানে না সুপ্রিয়র ঘুম আব কোন দিনই ভাঙ্গবে না। অশেষ যাত্রার পথিক তখন তার জীবন সঙ্গিনীর হাত ধরে যাত্রা সুরু করেছে।

ভাস্করের কোঠরগত চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। ওর বুকটা হাপরের মত ওঠানামা করছে।

--"তুমি অমন করছ কেন ? না-না আর কোনও কথা নয় তুমি এবার শুয়ে পড়—"ভাস্করকে বিছানায় শুয়ে দিয়ে নার্সকে ডাকল সুপর্ণা। নার্স এসে ভাস্করকে ঘুমের ইনজেক্সন দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাস্কব ঘুমিয়ে পড়ল। ভাস্করের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল সুপর্ণা। নার্স এসে বলল -"এবারে আপনি বাড়ী যান মিস্ মুখার্জি। ওর শরীর খুবই দুর্বল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠা ভাল নয়।"

তের

এমনি করেই একদিন দেশের জন্যে সর্বস্ব দিয়েছিল ভারতবাসী। ভবিষ্যৎ ভারতের জনগন একদিন স্বাধীনতা, সম্মান আর শান্তির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করবে এই সংকল্প নিয়েই তারা সব রকম অত্যাচার অবিচার সহ্য করেছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের হোমানলে নিজেদের আহুতি দিয়েছিল। সেই তিল তিল করে আহরণ করা স্বাধীনতা আজ আমরা অর্জন করেছি। কিন্তু তবু আমাদের জীবনে শান্তি নেই। আজ দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে যা আমাদের বুদ্ধিকে, শক্তিকে, ধর্মকে চারিদিক থেকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে! আমাদের জীবনে আজ সমস্যার শেষ নেই। বহু রকম ঝড়ের ধাক্কায় আমরা ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, পীড়িত। জাতি আজ ক্ষমতার লোভে হিংসার অধীন, ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের হিসেব কষতে কষতে তারা সমষ্টির কল্যাণ চিন্তা ভুলে গেছে। আত্ম প্রচারের মোহ বিষ তাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে যা আমাদের সব কাজকে কলুষিত করে ফেলছে।

সুপর্ণার হঠাৎ মনে পড়ে যায় শংকরদের কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছেলে রজত সেনের কথা। দীর্ঘাঙ্গ, গৌরবর্ণ, নাকে চিবুকে কেমন এক কোমলতা, ব্যক্তিত্বের ব্যাঞ্জনা নম্র বিনীত। কথা বলেন আস্তে, হাসেন লাজুক অপ্রতিভতায় প্রভাতের মত স্নিগ্ধ। মৈত্রী বন্ধনের একটা আশ্চর্য আকর্ষণ শক্তি ছিল ওর স্বভাবে।

১৯৪২ এর ছাত্র আন্দোলনের সময় সবাইকে ডেকে জড় করতেন। সবাইকে সামনে দাঁড় করিয়ে রজত সেন বলতেন—"জানিস্, এমনি করলেই ইংরেজরা দেশ থেকে পালাতে পথ পাবে না। ইংরেজ তাড়াবার এইটেই একমাত্র অহিংস পথ।" অহিংস ছাত্র নেতা

রজতের হাতে পড়ে স্কুল কলেজের ছেলেদের সময়ে নাওয়া নেই খাওয়া নেই, ঘুম নেই। আইন অমান্য আন্দোলনকে মূলধন করে রজত সেন ছাত্র নেতা হতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন! ইংরেজ থাকবে না, দেশের মানুষ শান্তিতে তুবেলা তুমুঠো খেতে পাবে, মাথা গুঁজবার আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, চাকরী পাবে, রোগে ওষুধ পাবে, কোথাও কোন পার্থক্য থাকবে না। স্বাধীন ভারতের প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষের জন্য চিন্তা করবেন। তাদের মঙ্গল চাইবেন!

রজত সেন মাঝে মাঝে জেলে সুপর্ণার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বলতেন—"এম, এ পাশ করেছি দেশ স্বাধীন হলেই একটা ভাল চাকরী পেয়ে যাবো। তখন সবাইকে নিয়ে আসবো কলকাতায়। বোন তুটো বড় হয়ে উঠলো, ওদেরও বিয়ে দিতে হবে।"

আর একদিন দেখা করতে এলেন রুদ্র মূর্ত্তি নিয়ে—"এভাবে চলতে পারে না, আমরা কি মরে গেছি। গান্ধীজী এতকাল অখণ্ড ভারতের কথাই বলে এসেছেন এখন জিন্না সাহেবের চাপে পড়ে তিনি নাকি "টু নেশন" থিওরী মেনে নিয়েছেন। শুনছি বাংলা দেশও নাকি ভাগ হবে। গান্ধীজী সেটাও অনুমোদন করেছেন। এ দেশ হিন্দুর। এ দেশে মুসলমানদের স্থান নেই। তাদের ইচ্ছে হলে তারা যেতে পারে আরবে অথবা ইরাণে। আমাদের দেশের ওপর ওদের অন্যায় দাবী আমরা কিছুতেই মেনে নেব না।"

—"আমরা বোধহয় স্বাধীনতার নামে উন্মাদ হয়ে গেছি রজতদা তা না হলে দেশকে কেউ টুকরো টুকরো করে! তবু ইতিহাসের গতিকে আমরা সম্মান করি কারণ ইতিহাস কখনো অন্যায়কে ক্ষমা করে না।"

—"জান জিন্না সাহেব ফতোয়া জারি করেছেন—'হিন্দু মুসলমান তুই জাতি তাদের আলাদা মাতৃভূমি চাই'। সোজা হিসেব ওদের।

হয় হোমল্যাণ্ড দাও না দিলে ডাইরেকট এ্যাক্‌সন। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান!"

সত্যি সত্যই একদিন লড়াই সুরু হোল হিন্দু-মুসলমানের। রজত সেন সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলেন—"এতদিন চালে চাল দিয়ে বাস করেছি আমরা, ওরা কি আমাদের পর? ওরা আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারে না।" কেউ কেউ হেসে উত্তর দিল—'দাদা এই ডকট্রিনটা নিয়ে একবার ঢাকা কিম্বা নোয়াখালি ঘুরে যিশুখৃষ্টের মত ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আসুন। সেই মহান আদর্শ দেখে আমরাও ধন্য হই।' ক্রুশবিদ্ধ হয়েই ফিরে এসেছিলেন রজত সেন। কিন্তু তা 'ভালবাসার' ক্ষত নয়, 'ঘৃণার ক্ষত'। ক্ষমাহীন প্রতিহিংসার ব্রত নিয়ে ফিরে এসেছিলেন রজত সেন। তার মা আর বোন তুটোকে নিয়ে তার বাবা নৌকা করে রওনা হয়েছিলেন মান ইজ্জত বাঁচাবার আশায়। নৌকোব মাঝি নজুমিঞা আশ্বাস দিয়েছিল কাছাকাছি কোন হিন্দু এলাকায় পৌঁছে দেবে ওদের সেখান থেকে ওরা কলকাতায় চলে যাবে ছেলের কাছে। কিন্তু বেশীদূর এগোতে হয়নি ওদের। একদল লোক ছিপে করে এসে ওদের নৌকোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তার বাবা বাধা দিতে গেলে অনেকগুলো লোক মিলে তাকে জুলিয়াস সিজারের মত হত্যা করেছিল। মা ছুটে এসেছিলেন বাধা দিতে কিন্তু তাঁরও মাথায় পড়েছিল নির্মম লাঠির আঘাত। তারপর তাদের তুজনকে নদীর জলে ফেলে দিয়ে বোন তুটোকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মিশে গিয়েছিল ওরা। অনেক চেষ্টায় সংগ্রহ করা এই খবরটুকুই শুধু জানতে পেরেছিলেন রজত সেন তারপর ফিরে এসেছিলেন অন্য মানুষ হয়ে।

যুদ্ধের সঙ্গে বাংলাদেশে এসেছিল কালোবাজারী, চোরাবাজারী, আর মুদ্রাস্ফীতি। অবাঞ্ছিত লোকের হাতে এসেছিল লক্ষ লক্ষ টাকা তারা স্থায়ী আসন গেড়ে বসলো বাংলার বুকে। তাদের মহিমায় আর ইংরেজের কৌশলে তুর্ভিক্ষ এল বাংলা দেশে। চোরাপথে

চালান হল খাদ্যসম্ভার। সুজলা সুফলা বাংলার মানুষ না খেতে পেয়ে তিলে তিলে প্রাণ দিল। মা সন্তানকে বিক্রী করল, মেয়েরা নিজেদের দেহকে পণ্য করল, স্বামীস্ত্রীকে ছেড়ে দিল লম্পটের হাতে। ক্ষুধা—হাঙ্গার! এরই তাড়নায় পারিবারিক বন্ধন, স্নেহ, মায়া, মমতা, ধর্ম সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল। মেয়ে সংগ্রহের দালাল অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল আনাচে কানাচে। বাংলার সমাজ জীবন ভেঙ্গে পড়ল সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে। এ দাঙ্গার মূলেও সেই একই চক্রান্ত! তারাই দবিদ্র শ্রেণীকে এই হানাহানির হাতিয়ার করে তুলল। 'চিনির বলদের' মতই তারা রক্তপাত ঘটিয়েই আত্মতুষ্টি লাভ করলো।

এই সামাজিক ব্যাধিব স্রষ্টা যারা অনায়াসে তারা গা ঢাকা দিয়েছে। লাল দিঘীর লাল বাড়ীতে বসে একদিন যারা নরহত্যার ফর্মূলা বচনা করেছিল তারাই এখন শান্তির দূত হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গান্ধীজী বেলেঘাটার বস্তীতে আশ্রম করেছেন। সোবাবর্দী গান্ধী শবনাগত হয়ে গান্ধী ভজনা করছেন। গান্ধীজি আবেদন জানালেন—"একজন সৎ মুসলমান আর একজন সৎ হিন্দু পেলে আমি এ দাঙ্গা থামাতে পারি।" রজত সেন তখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফিরিস্তি শুনিয়ে বেড়াচ্ছেন সকলকে। কোনদিন উদ্‌ভ্রান্ত কোনদিন ক্লান্ত, কোনদিন ক্ষিপ্ত।

পতনের ইতিহাসে বাংলার স্থান সব প্রথম। নব যুগের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। পতনের পথ তৈরী হল ধাপে ধাপে। ঘৃণাকে মূলধন করে জন্ম নিল দুটি রাষ্ট্র। এরপর এল আর একটি হাস্যাস্পদ অধ্যায়—পুর্নবাসন। সেখানেও দরবার করতে গেলেন রজত সেন। দারোয়ানের বাধা না মেনে সোজাসুজি ঢুকে গেলেন মন্ত্রীমশায়ের ঘরে। মন্ত্রীমশাই ভ্রূকুটি তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি চাই?"

—"রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য কিছু প্রার্থনা আছে। যারা

পাকিস্তান থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে এখানে এসেছেন বিশেষ করে তাদেরই জন্যে।"

মন্ত্রীমশাই চিন্তিত হলেন, বললেন—"ভেবে দেখবো আপনার কথা—"

—"ভাবুন, কিন্তু ওদের ওপর অবিচার করলে আর কিছু না পারি আপনার সিংহাসনের টনক নড়িয়ে দেব।"

—"কি বললেন!" চীৎকার করে উঠলেন মন্ত্রীমশাই।

—"ইংরেজ আমাদের দমাতে পারেনি, আপনারা আর সে চেষ্টা করবেন না"—একটা অবহেলার দৃষ্টিপাত করে বীরদর্পে বেরিয়ে এসেছিলেন রজত সেন।

এরপর রজত সেন বেকার উদ্বাস্তু যুবকদের নিয়ে দল গড়লেন। সুপর্ণা তখন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। একদিন সন্ধ্যেবেলায় রজত সেন হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। রুক্ষ চেহারা, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, বললেন—"কাজ ফতে করে এলাম গৌরী।"

—"কি কাজ?"

—"ওদের শোভাযাত্রা ভেঙে দিয়ে এলাম।"

—"তার মানে?"

—"খাবার আর আশ্রয়ের দাবী নিয়ে মিছিল করে যারা এসেছিল পুলিশের লাঠি খেয়ে আধমরা হয়ে এখন তারা পাকা বাড়ীতে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে। খাওয়া থাকা সম্বন্ধে এখন ওরা নিশ্চিন্ত।"

—"আজকের হাঙ্গামার নায়ক তা হলে আপনি?"

—"আমি একা নই—আমি আর আমার দল।"

—"কেন এমন করে সর্বনাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন রজতদা?"

—"আমি তোমাদের মহাভারতের শকুনি মামা। উদ্দেশ্য পিতৃ হত্যা আর মাতৃহত্যার প্রতিশোধ। রাজনীতির পাশা তৈরী করেছি আমি। এর চাল থেকে কারও নিস্তার নেই।"

"—কিন্তু শোভাযাত্রীরা তো আপনাদের কোন ক্ষতি করেনি রজতদা। এই নিরীহ লোকদের ওপর অত্যাচার কি আপনি সমর্থন করেন?

—"না তা করিনে। কিন্তু এ ছাড়া তো আর উপায় নেই। কুরুকুল ধ্বংস করতে গিয়ে অনেক ভাল মানুষেরও জীবন হানি হয়েছিল কিন্তু তাতে শকুনির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। এইভাবে মানুষ যতই নির্য্যাতিত হবে ততই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, জনচেতনা জেগে উঠবে। এমনি করেই একদিন অন্যায়কে অন্যায় দিয়েই প্রতিরোধ করবে দেশের জনসাধারণ।" অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রজত সেন আবার বললেন—"একদিন মন প্রাণ দিয়ে দেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, নবযুগের স্বপ্ন দেখেছিলাম কিন্তু আজ আর দেখিনে। আজকের স্বপ্ন শুধু একমুঠো ক্ষুধার অন্নের। সেই ধান্ধাতেই আজকের দিনের মহাজনদের মোসায়েব হয়েছি আমরা। কখনো ছলে, কখনো বলে পেটের অন্ন জোগাড় করে নিই। দল গড়েছি কারণ আজকের যুগে দল ছাড়া বাঁচবার উপায় নেই। দল আছে বলেই ইলেক্সনের কাজ করবার জন্যে আমাদের ডাক পড়ে। দল আছে বলেই কোন কিছু পাচার করতে হলে আমাদের ডাক পড়ে। মোটা টাকা আদায় করতে কত ঘৃণ্যস্তরে নেমে যেতে হয় আমাদেব। আমরাই নিরীহ লোকদের মার খাইয়ে জনচেতনা জাগিয়ে তুলি। একদিন এম. এ পাশ করবার পর বাবা মার আশীর্ব্বাদ নিয়ে কলকাতায় এসে ছিলাম চাকরীর খোঁজে। মা বাবাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম একটা কাজ জোগাড় করেই তাঁদের নিয়ে আসবো কলকাতায়। ভেবেছিলাম দেশ স্বাধীন হলে কাজের অভাব হবে না।" বলতে বলতে রজত সেনের গলা ধরে এল, ঝরঝর করে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ঝরে চশমার কাঁচের ওপর। চশমার কাঁচ মুছবার ভান করে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বললেন—"এই দুখানা হাত দিয়ে অনেক প্রতিশোধ নিয়েছি গৌরী

কিন্তু তাতে মন ভরেনি। মনে হয়েছে ওদের কি দোষ? ওরা তো রাজনীতির দাবাখেলার ঘুটি।"

—"হিংসা দিয়ে হিংসার সমাপ্তি আসে না রজতদা। হিংসার শেষ নেই। সব কিছু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখলেই শান্তি পাওয়া যায়।" রজত সেনের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি, বললেন—"কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে" তারপর ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

এরপর অনেকদিন রজত সেনের সঙ্গে দেখা হয়নি স্বপর্ণার। একদিন একটি ছেলের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো রজত সেন আলিপুর জেলে। কোনরকম দ্বিধা না করেই স্বপর্ণা দেখা করতে গেল তার সঙ্গে। স্বপর্ণাকে দেখে অবাক হয়ে গেল রজত সেন। স্বপর্ণা একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল —"হঠাৎ এ তীর্থস্থানে কেন রজতদা?"

—"পুণ্যাত্মারাই তো তীর্থস্থানে আসে গৌরী। আসতে হবে জানতাম, অন্যায় জেনেই অন্যায় করেছি। যখন ওদের কাজ ছিল আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে, মুঠো মুঠো অর্থও হাতে তুলে দিয়েছে তার বিনিময়ে। কিন্তু এখন আর ওদের কাজ নেই তাই আমার স্থান হয়েছে এখানে। তবে রাত্রির পরই দিন আসে সেই দিনটির জন্যেই আমি প্রতীক্ষা করছি।" রজত সেন হাসলেন। হাসি দিয়ে কান্নাকে আড়াল করবার সে এক অদ্ভুত চেষ্টা।

সেই শেষ দেখা রজত সেনের সঙ্গে। জেল থেকে বেরোবার পর আর কেউ তার সন্ধান পায়নি। রজত সেনের অন্তর্ধান সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই। কেউ বলে জেল থেকে ছাড়া পাবার পর রজত সেন আত্মহত্যা করেছেন, কেউ বলে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে কেদারনাথ গিয়ে শান্তির পথ খুঁজছেন।

চোদ্দ

গৌরী কলেজ যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। শংকর এসে ঘরে ঢুকল।

—"কলেজ তো বন্ধ"—

—"সে তো জানি, কিন্তু ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না বেরোতেই হবে যে আমাদের। কলেজের ছুতো করে না বেরোলে মা তো ভেবে অস্থির হবেন।"

—"আজ ভাস্করদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, উনি আজ প্রসেসনে থাকতে পারবেন না বললেন। ডাক্তার হালদারের মিটিং এ্যাটেণ্ড করতে হবে তাকে।"

—"আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেলেন।"

—"তোকে বলতে বললেন আমায়। ভীষণ ব্যস্ত আজ। উনি যেখানে থাকেন তার ছেলেকে রানাঘাটে তার মামার বাড়ীতে রেখে আসতে হবে, তিনটের মধ্যে আবার মিটিং এ্যাটেণ্ড করতে হবে। কাল আসবেন বলেছেন।"

—"তুই কি প্রসেসনে থাকবি?"

—"নিশ্চয়ই, তুই থাকবি নে?"

—"ভাবছি।"

—"এখনও ভাবছিস্। মাতঙ্গিনী হাজরার রক্ত যে এখনও শুকোয়নি!" শংকর গুণ গুণ করে গান গেয়ে ওঠে—

"ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গিনী মেতেছে আজ্ সমর অঙ্গনে"

—"বাবা,-মা এদেরও তো অস্বীকার করা যায় না-শংকর"—

—"পেছনে চাইলে সামনে এগোন যায় না গৌরী, ঠাকুমার

গল্পের সেই রাজপুত্রেদের মত পাষাণ হয়েযেতে হয়। বিনয়, দীনেশ, বাদল, প্রদ্যোৎ এদেরও তো সবই ছিল কিন্তু পেছনের স্নেহের আকর্ষণ ওদের তো পেছনে টেনে আনেনি, সামনেই এগিয়ে দিয়েছে।"

—"তুই বড় বাক্য বাগীশ হয়েছিস শংকর। যা চান করে আয়, একসঙ্গেই খেতে বসবো। বাবার আজ শ্যামবাজারে ডিউটি পড়েছে।"

বেরোবার আগ মুহূর্ত্তে সুপর্ণা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

—"কি রে হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছিস্?"

—"তোকে। তোকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে শংকর।"

—"হঠাৎ"

—"হঠাৎই। কেন যেন আজ তোকে বড় ভাল লাগছে। বড় দূরের মনে হচ্ছে। আজ প্রসেসনে নাইবা গেলি শংকর। কেন জানিনে আজ মনে তেমন জোর পাচ্ছি-নে। মনে হচ্ছে কোন একটা অশুভ এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।"

—গৌরী তুই আমার দিদি না হয়ে ছোট বোন হলেই বোধ হয় ভাল হত। শান্তি, সুনীতি, প্রীতি ওয়াদ্দারের দেশের মেয়ে হয়ে তোর এত দ্বিধা, এত ভয়!"

—"চারিদিকে কি সব ঘটছে দেখছিস তো তুই। আমি ভাবছি মার কথা, বাবার কথা ওদের ওপর কি আমাদের কোন কর্ত্তব্যই নেই?"

—"নেই কে বলেছে? কিন্তু সবার ওপরে দেশ, দেশের স্বাধীনতা। পরাধীনতার গ্লানিতে তিল তিল করে মরবার চেয়ে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংগ্রাম করে মরা অনেক গৌরবের।"

—"বাবার কথা মনে হলে আমার কান্না পায় শংকর। আমার বাবার মত কেউ কি এমন করে তার ছেলেমেয়েকে ভালবাসেন?"

—"নিজের ছেলেমেয়েকে সবাই ভালবাসে গৌরী!"

—"তুই একটা ক্রুর শংকর!"

শংকর হা হা করে হেসে ওঠে—"এই বারে ঠিক বলেছিস্

গৌরী—"

—"গৌরী, গৌরী, গৌরী—দিনরাত নাম ধরে ডাকা। কেন দিদি বললে দোষ হয় কিছু ?"

—"তা দিদিমনি হঠাৎ আমায় পশু বললে কেন ? আমার কি শিং আর লেজ আছে ?"

—"লেজ না থাকলেও শিং তোর আছে। গুতোতে পেলে ছাড়িস নে। তা হ্যাঁরে আজ কোনদিকে প্রোগ্রাম তোদের ?"

—"ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে প্রসেসন শুরু হবে, আসবে শ্যামবাজারের ওপর দিয়ে।"

—"আমিও যাব তোর সঙ্গে, থাকবো পাশে পাশে।"

—"কে বা আগে প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি কাড়াকাড়ি ?" আবার হা হা করে হেসে ওঠে শংকর।

দুর্গা ঘরে এলেন হাসিমুখে।—'কি রে ভাইবোনে এত হাসছিস্ কি নিয়ে ?"

—"দেখনা মা গৌরী আমায় জানোয়ার বলল"

—"বেশ করেছি বলেছি, তুই আমায় সব সময় নাম ধরে ডাকিস্ কেন। যখন ছোট ছিলি বলেছিস্ এখন বুড়ো ধাড়ি ছেলে দিনরাত দিদিকে গৌরী—গৌরী— ।"

দুর্গা ছেলে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে সস্নেহে হাসলেন। —"তোদের এ ব্যাপারের মীমাংসা আর কোনদিনই হবে না রে। তা হ্যাঁ রে ভাই বোনে সেজে গুজে চললি কোথায় এ ডামাডোলের বাজারে ?"

"—একবার কলেজে যেতে হবে মা।"

—"ও মা কলেজ তো বন্ধ রে, আজ আবার কলেজ কিসের ?"

—"যাব আর আসবো। দুজনে একসঙ্গে যাব একসঙ্গেই ফিরব।"

—"বুঝি নে বাপু তোদের। তোর বাবাকে এত করে বললাম

শরীর ভাল নেই আজ আর বেরিয়ে কাজ নেই। মানুষের প্রাণ আগে না কাজ আগে? তা শুনলো আমার কথা? গবর্ণমেন্টের ডিউটির নাকি নড়চড় হবার জো নেই। আমারই হয়েছে যত জ্বালা। কেউ আর আমার কথা শোনে না।" রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দুর্গা।

দুহাত দিয়ে নিজের কপালের দুটো পাশ টিপে ধরল সুপর্ণা, আব ভাবতে পারছে না ও। আজ রাতে সুপর্ণার অবচেতন মন এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তায় ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। যে ঘটনাটা ওর মনের দরজায় দুষ্টু ছেলের মত বারবার উঁকি দিয়ে যাচ্ছে তাকে ও না দেখার ভান করে মনের দরজা থেকে বারবার ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আর ও পারছে না সেই দুষ্টুটাকে ঠেকিয়ে রাখতে—
"তু কি—তু-কি—গৌলী লে আমি লুকিয়েছি—তুই খুজে বেল্ কল্—"

—না না আমি পারিনে আমি পাববো না; হাহাকার করে কেঁদে উঠে সুপর্ণা মুখার্জি। নিস্তব্ধ রাত্রির নীরবতা ভেঙ্গে গেল যায় গলার স্বরে। বিছানার ওপর উঠে বসে সুপর্ণা। ওর দুচোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। বিছানা থেকে নেমে এসে খোলা জানালার পাশে দাঁড়ায়। কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাত। ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের মধ্যে দিয়ে একফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। সামনের ওই জ্বলজ্বলে তারাটাই বোধহয় শুকতারা। এই তারাটাই ছিল সন্ধ্যেবেলায় সন্ধ্যেতারা। আঁচলে চোখ মুছে জানালার শিক ধরে আকাশের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুপর্ণা।

মিছিল—মিছিল। কী বিরাট মিছিল। হাজার হাজার মানুষের উদ্বেলিত জনস্রোতে মহানগরীর জনপথ উপছে পড়ছে। —বন্দে-মাতরম—" "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—" "ইংরেজ ভারত ছাড়" "কুইট ইণ্ডিয়া"—কেঁপে কেঁপে উঠছে মহানগরী। অনেক মুখ, অনেক ছেলেমেয়ে। সুপর্ণার চোখের

সামনে ভেসে উঠল একটি মুখ—নিষ্পাপ স্বপ্নময়। কোমল অথচ কঠিন। জ্বলন্ত অঙ্গার কেটে যেন সে মুখ তৈরী করা হয়েছে। হাতের মুঠোয় ধরা জাতীয় পতাকা। মিছিলের আগে আগে এগিয়ে চলেছে সে।

"ষ্টপ্" ! —রুখে দাঁড়াল পুলিশ আর মিলিটারী বাহিনী। ঘোড়ার পিঠে মাউন্ট পুলিশ জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিছিলের ওপর। পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চার্জ আরম্ভ করল। কতগুলি ছেলে রক্তাক্ত শরীরে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তখনও পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চার্জ করছে নিরস্ত্র জনতার ওপর।

অলিগলি থেকে তখন ইট পাটকেল সোডার বোতল এসে পড়তে আরম্ভ করছে পুলিশের ওপর। জাতীয় পতাকা হাতে ছেলেটি একটা উঁচু জায়গায় উঠে দাঁড়িয়েছে—"আমরা স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করছি ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর জীবন ধ্বংস করেছে। নৈতিক রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক দৈহিক সব দিক থেকে ইংরেজ আমাদের নিঃস্ব করে দিয়েছে। ইংরেজকে ভারত থেকে বিতাড়িত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ "—রিনরিনে সুরেলা অথচ তীব্র কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে! ভাষার তীব্রতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত কেঁপে উঠল গৌরী? স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জনতার একপাশে তারপর চীৎকার করে উঠল—"শংকর। শংকর শুয়ে পড়, পুলিশে গুলি ছুঁড়ছে"—জনতাকে ঠেলে ছুটে চলল গৌরী। বিপরীত দিক থেকে পুলিশের একজন পদস্থ অফিসার পাগলের মত ছুটে আসছেন মিলিটারী ব্যূহ ভেদ করে।

—"ষ্টপ্ শুটিং—" মিলিটারী অফিসারের সামনে এসে রুখে দাঁড়াল পুলিশ অফিসাব।

—"হু ইউ টু অর্ডার ?" নেকড়ের মত গর্জন করে উঠল মিলিটারী অফিসার, তারপর চিৎকার করে উঠল—"ফায়ার—"।—

"না না ওরা শিশু, ওরা নিরস্ত্র, ওরা অহিংস"—

—"হোয়াট্ ডাজ্ হি সে? মাষ্ট বি এ চ্যালা অব গ্যাণ্ডী —" মিলিটারী অফিসার সরোষে বেয়নটের খোঁচা দিলেন পুলিশ অফিসারের মাথায়?

—"শংকর শংকর শুয়ে পড়"— মাথার ক্ষত দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরে পুলিশ অফিসার বরেন মুখুজ্যের খাঁকী পোযাক লাল হয়ে যাচ্ছে। সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। পাগলের মত জনতাকে ঠেলে ছুটে চলেছেছেন জাতীয় পতাকা হাতে তলোয়ারের ফলার মত তীক্ষ্ণ সুন্দর ছেলেটির দিকে সে তখনও তার রিন রিনে গলায় জল তরঙ্গ বাজিয়ে চলেছে—"বল বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক —"

বুলেটের শব্দ, ধূয়োর কুণ্ডলী, মানুষেব চীৎকারে চারিদিক কেঁপে উঠল। রক্ত মাখা শরীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শংকব। শংকরকে দুহাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন বরেন মুখুজ্যে—শংকর-শংকর।"

গুলির বিরাম নেই। এক ঝাঁক গুলি এসে পড়ল বরেন মুখুজ্যের মাথার ওপর? ছেলেকে বুকে জড়িয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

—"ইউ ব্রুট! সরে দাঁড়াও - আমার পথ ছাড়, যেতে দাও আমায়। বাবা বাবা, শংকর শংকর, ওরা যে আমায় যেতে দিচ্ছে না! ছাড়, ছাড়, ছেড়ে দাও আমায়"—হঠাৎ জনতার মধ্যে থেকে একটা থান ইট এসে পড়ল পাঠান সৈন্যটার মাথায়। দুহাতে মাথা ধরে ওখানেই বসে পড়ল সে। জনতা উল্লাসে চীৎকার করে উঠল-বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক—।"

গৌরী ততক্ষণে ছুটে এসে লুটিয়ে পড়েছে বরেন মুখুজ্যে আর শংকরের নিস্পন্দ দেহের ওপর।

"বাবা-বাবা কথা বলছ না কেন। শংকর ওরে শংকর এত কথা তোর, তুই কেন চুপ করে আছিস্। ওরে একটা কথা অন্ততঃ বলে দে আমি মাকে গিয়ে কি বলব? বাবা বাবা বল আমি মাকে গিয়ে

কি বলব ? শংকর শংকর আমি মাকে গিয়ে কি বল—বো”—হঠাৎ কে যেন ওকে হিচড়ে তুলে নিল। —“যাও ওকে পুলিশ-ভ্যানে তুলে লাল বাজারে পাঠিয়ে দাও। সাবধানে নিয়ে যাবে—এ লেডি অব্ ডেনজারাস টাইপ—”।

পনেরো

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পাশ হল ‘ইণ্ডিয়া ইনডিপেণ্ডেনস্ এ্যাক্ট্’ যার ফলে ভারত দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল। ভারতের জাতীয় জনক আখ্যা পেলেন মহাত্মা গান্ধী আর পাকিস্তানের জাতীয় জনক আখ্যা পেলেন মহম্মদ আলি জিন্না। এল সেই বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা। তারপর ? তারপরও দেশের মানুষ হাহাকার করে কেঁদে উঠল। রাজনীতির কূটিল চক্রান্তে তাদের ঘর গেল, সম্মান গেল ক্ষেত খামার গেল ব্যবসা বানিজ্য গেল, পুকুর গেল, ফলে ভরা বাগান গেল, গোয়াল ভরা গরু গেল, মরাই ভরা ধান গেল, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সব গেল। তাদের নাম হ’ল উদ্বাস্তু। সর্বস্বান্ত হয়ে তারা লঙ্গরখানায় এসে আশ্রয় নিল। ক্রমে ক্রমে ষ্টেশন, প্লাটফরমে, রাস্তার ধারে, গাছতলায়, ফুটপাতে, পার্কে ক্যাম্পে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তাদের পরিচয়। তাদের দুঃখের কথা লিখে কবিরা কাব্য রচনা করলেন, তাদের দুঃখ দূর করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন প্রকল্পের খসড়া তৈরী করলেন, রাজনৈতিক নেতারা গরম গরম ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। দয়ার অবতার কর্তৃপক্ষরা তাদের শুভ কামনায় উঠে পড়ে লাগলেন। দেশে দাঙ্গার সময় গুণ্ডারা তাদের ওপর অত্যাচার করেছিল, নির্য্যাতন করেছিল, হত্যা করেছিল, ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছিল তাদের ওরা চিনেছিল কারণ তাদের কোন মুখোস ছিল না’।

কিন্তু সরকারী মুখোসের আড়ালে যে মূর্তি তাদের সামনে এসে দাঁড়াল তা আরও ভয়াবহ আরও ভয়ঙ্কর। তাদের পশু প্রবৃত্তির কাছে আত্মবিসর্জন দিতে হল বহু মানুষকে। পুনর্বাসনের জন্য তাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হল, আন্দামানে চালান করা হল, প্রদেশ সরকারের পতিত জমিতে তাদের ঘর বাঁধবার পরিকল্পনা করা হল। উদাস্তু পুনর্বাসনের নাম করে স্বাধীন ভারতের হিসেবের খাতায় একটা বিরাট অঙ্কের খরচ দেখানো হল। কিন্তু কি হল তাতে? তারা কি তাদের সেই লুপ্ত মর্য্যাদা আবার ফিরে পেল?

এরপরও ভারতের ওপর দিয়ে অনেক তুফান বয়ে গেল। পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণ চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ এমনি ধারা একটার পর একটা। পৃথিবীতেও অনেক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে গেল। যুগের তালে তালে পা ফেলে মানুষকেও এগিয়ে যেতে হয়েছে। যুগ যন্ত্রণা তাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন বিচার বুদ্ধি আর নতুন সত্যের সন্ধান দিয়েছে।

মানুষের ইতিহাস, উত্থান পতন ঘাত প্রতিঘাতেরই ইতিহাস। মহাকালের দৃষ্টিতে একটা যুগ কতটুকুই বা। মানুষের বাঁচার ইতিহাসে আর একটি নতুন যুগের সৃষ্টি হল—সে যুগ টাকার যুগ, বেচা-কেনার যুগ। টাকাই ধীরে ধীরে মানুষকে রূপান্তরিত করল। স্নেহ, দয়া, মায়া, ভালবাসা—সবই হল টাকার শিকার। মৃত্যুর চেয়েও কঠিন, মৃত্যুর চেয়েও শক্তিশালী হল টাকা। এই টাকার খেলায় মানুষ বদলে গেল—অতীত যুগের মানুষ হারিয়ে গেল। যার যত টাকা সেই তত বুদ্ধিমান, সেই তত ধার্মিক, সেই তত সহৃদয়। টাকার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আত্মীয় স্বজন বাড়ল, বন্ধু বান্ধব বাড়ল, ভক্তের সংখ্যা বাড়ল, গলগ্রহের সংখ্যাও বাড়ল। টাকার জন্যেই আজকের মানুষের যত জ্বালা। ক্ষমতাব জ্বালা, অক্ষমতার জ্বালা, দাসত্বের জ্বালা। টাকার যাদুদণ্ডের প্রভাবে অতীত যুগের উত্তরপুরুষ নবরূপে রূপান্তরিত হল। টেরিলিনপ্যান্ট, টেরিলিনসার্ট, নয়া ডিজাইনের

জুতো পরে চূড়ো করা চুল নিয়ে ওরা জায়গায় জায়গায় দল বেঁধে অফুরন্ত ধোঁয়া ওড়ায় আর তার সঙ্গে ওড়ায় বিশ্ব সংসারের সব কিছু। রসনা ছাড়া ওদের আর সবই নিষ্ক্রিয়। ওরা যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে। বড় বড় কথা, লম্বা লম্বা কথা, তেতো কথা, বিস্বাদ কথা, অশালীন কথা। কথার নেশাতেই ওরা সারাদিন মশগুল হয়ে থাকে।

স্বাধীন ভারতে মুক্তি পেল বহুলোক। সুপর্ণা আর ভাস্করও মুক্তি পেল। যেদিন সুপর্ণা কারাপ্রাচীরের বাইরে এসে দাঁড়াল সেদিন তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে কেউ ছিল না। ক্লান্ত পায়ে একটু এগিয়ে যেতেই একটি ছেলে এসে দাঁড়াল ওর সামনে— "আমার সঙ্গে আসুন গৌরীদি"—

—"তোমায় তো চিনতে পারলুম না ভাই—

—"আমি অবিনাশ দারোগার ভাই নিখিলেশ, আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

সুপর্ণার চোখ দুটো জ্বলে উঠল—"এত লোক থাকতে তুমি কেন?"

—"এত লোক আর নেই গৌরীদি—আপনার মা কিছুদিন আগে মারা গেছেন। আপনার ছোট ভাই আর বোনকে আপনার মামা এসে নিয়ে গেছেন। অবশ্য আপনাদের বাড়ীটা ঠিকই আছে। আমরা পাড়ার ছেলেরা পালা করে আপনাদের বাড়ী পাহারা দিই।

দুহাতে মুখ ঢেকে ধুলোর ওপরই বসে পড়েছিল সুপর্ণা। নিখিলেশ ব্যস্ত হয়ে উঠল—"কথাটা বলতে বৌদি আমায় বারবার মানা করে দিয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আপনি কাঁদবেন না গৌরী দি। একটু বসুন আমি একটা ট্যাক্সী ডেকে নিয়ে আসি।

বাড়ী ফিরে অবাক হয়ে গিয়েছিল সুপর্ণা। ঝকঝকে তকতকে বাড়ী। রান্নাঘরে রান্না করছেন অবিনাশ দারোগার স্ত্রী জ্ঞানদা

দেবী। সুপর্ণা আসতেই তিনি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন—"এস মা গৌরী—"। সুপর্ণা প্রণাম করলে তিনি তার চিবুকে আঙ্গুল ছুঁইয়ে ঠোঁটে ঠেকালেন তারপর সস্নেহে বললেন—আগে স্নান করে খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও তারপর সব শুনবে।"

সে একটা ইতিহাস। এতবড় আঘাত সইতে পারেননি দুর্গা। তারপর যে কয়দিন বেঁচে ছিলেন বিছানা থেকে উঠতে পারেননি তিনি। খবর পেয়ে দুর্গার ভাই তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন ওদের নিয়ে যেতে। দুর্গা যান নি। সীমা আর শেখরকে নিয়ে মাস-খানেক পরে তিনি চলে গিয়েছিলেন। ওরা এখন সেখানেই পড়শোনা করছে। পাড়ার ছেলেরা নিয়মিত আসা যাওয়া খোঁজ খবর নিত। তাদেরই মা মাসীরা দুর্গার ভার নিলেন, বললেন—গৌরী ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরাই দেখাশোনা করব।" টাকা পয়সার একটা ব্যবস্থা করে আবার আসবেন বলে আশ্বাস দিয়ে দুর্গার ভাই চলে গেলেন সীমা আর শেখরকে নিয়ে। এর কয়েকদিন পরেই অবিনাশ দারোগার বিধবা স্ত্রী তার দেওরকে সঙ্গে করে তাদের কলকাতার বাড়ীতে চলে এলেন। বরেন মুখুজ্যের সব খবর তিনি ওখান থেকেই জেনেছিলেন। এসেই দেখা করলেন দুর্গার সঙ্গে। কিন্তু দুর্গার তখন আর কথা বলবার শক্তি নেই নির্বাক পাথরের মূর্ত্তির মত তিনি পড়ে থাকেন, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন শুধু। সেই দিন থেকেই এ সংসারের হাল ধরলেন জ্ঞানদা দেবী।

অবিনাশ দারোগার মৃত্যুটা তিনি সহজভাবেই মেনে নিয়েছিলেন। তদারক করতে এসে পুলিশ তরফের লোক তাকে অনেক প্রশ্নই করেছিল—"আপনি কি অবিনাশ বাবুর মৃত্যুর ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করেন?"

—"কাকে সন্দেহ করব বলুন? তিনি তো জীবনে কোন ভাল কাজ করেন নি—বহুলোকের সর্বনাশ করেছেন, তার মধ্যে কে এমন

কাজ করতে পারে অনুমান করা কি সহজ ?”

অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে তিনদিনের দিন অবিনাশ ঘোষালের শেষ কাজ করে তারপরদিনই তিনি চলে এসেছিলেন কলকাতায়। ওখানকার কোন জিনিষ সঙ্গে আনেননি। সুপর্ণার চোখের জল আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন—“তোমার মা সতীসাধ্বী ছিলেন—তোমার বাবার মৃত্যুসংবাদটা তার স্মৃতিশক্তিতে বিকল করে দিয়েছিল। সেই অবস্থাতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।”

‘পলিটিক্যাল সাফারার’ হিসেবে স্বাধীনভারতে সুপর্ণার একটা চাকরীও মিলে গেল। তেমন কিছু নয় অত্যন্ত মামুলী চাকরী কিন্তু এ চাকবীরও তার প্রয়োজন ছিল। ছোট ভাই বোন দুটিকে মানুষ করা আর ভাস্করকে বাঁচিয়ে তোলা। সেদিন হাজার হাজার তরুণ তরুণীদেরও সঙ্গে ভাস্করও ছাড়া পেয়েছিল। ষ্ট্রেচারে করে ভাস্করকে বাইরে নিয়ে আসা হল। নির্মম অমানুষিক অত্যাচার তাকে চিরদিনের জন্যে পঙ্গু করে দিয়েছে—এযেন ভাস্কর নয় তার প্রেতমূর্ত্তি। ভাস্করকে পাঠাতে হল সরকারী যক্ষ্মা হাসপাতালে। সেদিন সুপর্ণাব যে পথ চলা সুরু হয়েছিল আজও তা শেষ হয়নি। যাদের নিয়ে ওর জীবন সুরু হয়েছিল আজ তারা কেউ নেই তার আশেপাশে। যে চাকরী তাকে সেদিন সংসারের প্রয়োজনে নিতে হয়েছিল আজ তা একমাত্র নিজের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অফিস ফেরৎ হাসপাতালে যায় সুপর্ণা। হাতে ফল, মিষ্টি, ধূপকাঠি, টুকিটাকি কত কি। গিয়েই ষ্টোভ জ্বেলে সুজি করে, ডিমের মামলেট করে, হরলিকস করে, শুকনো ফুল ফেলে দিয়ে তাজা ফুল সাজিয়ে রাখে ফুলদানীতে, ধূপকাঠি জ্বেলে দেয়।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে ভাস্কর।

—“কি হ’ল ? আজ কি তোমার কাজ শেষ হবে না ?”

এক মিনিট। তোমাকে খেতে দিয়েই বসছি—

খেতে খেতে ভাস্কর বলে—“আমার জন্যে কেন এত টাকা খরচ

করছ গৌরী ? তুমি তো জান আমার এ রোগ সারবার নয়।”

—“তার মানে ? তুমি কি বলতে চাও আমায় একা ফেলে রেখে তুমি মজাসে কেটে পড়বে।’

—“তুমি আমায় ভাবিয়ে তুলেছ গৌরী। আমার এ জরাজীর্ণ দেহটাকে জিইয়ে রেখে তোমার কি লাভ বলতো ?”

—“জরাজীর্ণ নয়, অত্যাচার জীর্ণ। জেলে তোমার ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে তা তো তোমার অজানা নয়। নির্য্যাতনের যত রকম পন্থা আছে কিছুই তো বাদ যায়নি। শুধু অত্যাচার নিত্যি নতুন পদ্ধতিতে। একজন না পারলে দশজন মিলে করেছে। তবু তারা থামেনি। সেই পৈশাচিক নির্য্যাতনের ফলেই আজ তুমি অসুস্থ। তোমায় আমি ভাল করে তুলবোই। বল পারবো না ?”

—মৃত্যুকে কি বেঁধে রাখা যায় গৌরী !

—“যায়-যায়—মৃত্যুকেও জয় করা যায়। শোননি সাবিত্রী আর আর বেহুলার—উপাখ্যান”—

—“ও তো উপাখ্যান ! মানুষের মন গড়া সান্ত্বনা। ও তো সত্যি নয়-গৌরী—।”

—“সত্যিটা তবে কি ? তোমার মরে যাওয়া ? বল চুপ করে আছ কেন ?” হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে সুপর্ণা।

—“মরতে আমি চাইনে গৌরী। তোমার মুখের দিকে চাইলে বাঁচবার জন্যে আমার প্রাণ আকুলি বিকুলি করে কিন্তু তবু ভরসা পাইনে, জোর পাইনে। চোখের আড়াল হলেই মনে হয় আর বুঝি দেখা হবে না। ওকি মুখ ফিরিয়ে বসলে যে। রাগ করলে ?”

—“রাগ না ছাই ! কেই বা আমার রাগের মূল্য দেয় ?”

—“গৌরী লক্ষ্মীটি, প্লিজ রাগ করো না—” সুপর্ণা যখন মুখ তুলল তখন ব্যথায় বেদনায় ওর মুখ খানা থমথম করছে। চোখের জলকে চেপে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টায় ওর মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে।

বিছানার পাশে রাখা সেলফের ওপর থেকে ছোট আয়নাখানা তুলে নিয়ে সুপর্ণার মুখের সামনে ধরে হাসিমুখে ভাস্কর বলল-"দ্যাখ দ্যাখ কি ভীষণ বিউটিফুল লাগছে তোমায়। ছবি আঁকবার সরঞ্জাম হাতের কাছে থাকলে তোমার এ পোজটা শাশ্বত করে রাখতাম।" আয়না খানা ভাস্করের হাত থেকে নিয়ে দূরে সরিয়ে রাখে সুপর্ণা। জলভরা চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে ভাস্করের দিকে তারপর বলে আচ্ছা তুমি কি আমার মধ্যে শুধু ছবি আঁকবার উপাদানই খুঁজে পেলে চিরকাল? আর কিছু পেলে না? তুমি তোমার নিজের স্বাতন্ত্র্য গৌরবের অধিকারটিই কেবল চিরদিন ব্যবহার করে গেলে। এই অহঙ্কারে তুমি কোনদিন জানতেও পারলে না তুমি কি পেয়েছিলে।"

—"এ তোমার ভুল ধারণা গৌরী—! প্রেমের শতদল পদ্ম অহঙ্কারের বৃন্তকে আশ্রয় করেই ফুটে ওঠে। তবে এ কথা সত্যি তোমাকে রাগিয়ে আনন্দ পাই।"

"তা আমি জানি। তুমি হচ্ছ মরুভূমির বাহন উট। এতটুকু রস কস নেই। খেতে পাচ্ছ না জল পাচ্ছ না তবু চলছ। বালি গরম হয়ে উঠেছে তবু চলছ। তখন মনে হয় সামনে বুঝি মরুভূমির আর শেষ নেই, বুঝি মৃত্যুছাড়া আর গতি নেই।"

—"একমাত্র নিষ্ঠাই শুষ্কতা আর রিক্ততার মধ্যে দিয়ে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। উটের মত ধীর সহিষ্ণু আর আর অধ্যবসায়ী জীব আর কে আছে বল?"

—"আচ্ছা উট মশাই এবার আমায় উঠতে হবে। আমি তোমাদের হাসপাতালের ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলে আসি।"

"কি সম্বন্ধে?"

"তোমায় বাড়ী নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে—".

"কেন নিজের বোঝা আরও বাড়াবে গৌরী? এখানেই তো বেশ আছি—"

-"বাজে বকোনা তো। হাসপাতাল তোমার শ্বশুর বাড়ী—কিনা তাই চিরকাল রেখে দেবে এখানে। যে অসুখের জন্য তুমি এখানে এসেছিলে সে অসুখ তোমার সেরে গেছে। এবারের এক্সরে রিপোর্ট একেবারে 'নীল'। সাধারণ স্বাস্থ্যও তোমার অনেক ভাল একমাত্র এ্যানিমিয়া, তা সে বাড়ী গেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

ষোল

সেদিনও অফিসে নিজের কাজের মধ্যে ডুবে ছিল সুপর্ণা। আজ একটু সকাল সকাল অফিস থেকে বেরুতে হবে। হাসপাতাল থেকে ভাস্করকে বাড়ীতে নিয়ে এসেছে। সে বেচারী সারাটা দিন একা একা ঘরে বসে আছে। সীমা আর শেখরকে এখনও নিয়ে আসতে পারছে না মামার বাড়ী থেকে। ওদের ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই ওদের থাকতে হবে? শেখর এবার আই. এ দেবে, সীমা দেবে ম্যাট্রিক। মামার অবশ্য ইচ্ছে ওরা ওখানে থেকেই পড়াশোনাটা শেষ করুক কিন্তু সুপর্ণার একা একা আর ভাল লাগে না। পরীক্ষা শেষ হলেই ওদের নিয়ে আসবে।

ভাস্করের জন্যে নিজের দক্ষিণ খোলা ঘরখানিই সাজিয়ে দিয়েছে সুপর্ণা। খোলা আকাশের নরম নীল রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ঘরের পর্দা, বেডকভার, টেবিল ক্লথ, সোফার কভার। খাটের পাশে ছোট্ট টিপয়ে ফুলদানীতে রজনীগন্ধা। এক কোনে নীল পর্দার গায়ে ইজেল, তার পাশেই ছবি আঁকবার সরঞ্জাম। বুক সেলফে রবি ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, সত্যেন দত্ত, রজনী সেন, অতুল সেন এদের কবিতা আর গানের বই। কবিতা পড়তে ভালবাসে ভাস্কর। ভাস্কর তো ওর কাছে শুধু ভাস্করই নয়, ওযে সুপর্ণার অস্তিত্ব। ভাস্করকে বাদ দিলে ওর যে কিছুই থাকে না। পাড়ার নতুন ডাক্তার আশ্বাস দিয়ে

বলেছেন—আপনি অত ভাববেন না মিস্ মুখার্জি। ভাস্করবাবু অল্পদিনেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

—"আপনার ওপরই আমি সম্পূর্ণ ভরসা করছি ডাক্তার গুপ্ত।'

এসটাব্লিশমেন্ট সেকসন এ তখন চায়ের গ্লাস হাতে সবাই গুলতানী করছে। অফিস টাইম দশটা পাঁচটায় কাজ শেষ করবার মত বোকা ওরা নয়। কাজ জমিয়ে ওভার টাইম নিতেই ওরা অভ্যস্ত। তাই কাজের কোন তাড়া নেই ওদের। চায়ের গ্লাস থেকে মুখ তুলে অধিকারী বাবু বললেন—"হ্যাশের কথা মনে পড়লে বুকটা পুড়ে যায় রে হেমন্ত। চার পয়সার এক খুটি দুধ। চার পয়সা হালি চিংড়ী রায়েক, বাঁশপাতা, পিউলী, পাবদা, চাপলে, বেলে, টাকী মাছ। দু আনায় দুমন ওজন রুই মাছের এত বড় চাকা। বিরাট বড় বড় মহাশোল মাছ তার এক একটা আঁশ যেন এক একটা পঞ্চম জর্জের আমলের রূপোর টাকা। পদ্মার ইলিশের পাথুরী, ভাপে সেদ্ধ, ভাজা, শুধু কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে ঝোল যেন এখনও জিভে লেগে আছে"—

—"আর বাজারের সেই বিরাট বিরাট বাঘাড় মাছ। দু খানা গরুর গাড়ী জোড়া দিয়ে তবে সে মাছ আনতে হয়। বঁটি দিয়ে ও মাছ কাটা যায় না, কুড়ুল দিয়ে কাটতে হয়। গরুর মত হাম্বা হাম্বা করে ডাকে বলে ও মাছ হিন্দুরা খায় না। কি দিনই পেছনে ফেলে এসেছি ভাই।"

—"এ তো তুই মাছের গল্প করলি। আজকের দিনে আড়াই টাকা মন চাল বললে কেউ বিশ্বেস করবে? আর সে কী চাল, ভাত তো নয় যেন নারকেল কোড়া। আর সেই দিনাজপুরের কাটারী ভোগ চিঁড়ে, বদরগঞ্জের শুখো দই?, হাঁড়ি উপুড় করে রাখ দই পড়বে না। আর সিরাজগঞ্জের রাঘবশাই—আঃ ভাবলেও জিবে জল আসে।"

—"ইয়া বড় বড় মর্ত্তমান কলা, কুসুরে টিমে গুড়, গোয়ালন্দের

তরমুজ বেলকুচির জোলার সাড়ী, ঢাকাই মসলিন—ভাইরে ছাড়ান দে, ছাড়ান দে। পোড়া ঘা খুঁচিয়ে আর রক্ত বের করিস নে।”

—“সে সব দিনের কথা মনে হলে মনটা হু হু করে ওঠে। মনে হয় আমরা মরে ভূত হয়ে ভুসুণ্ডীর মাঠে এসে আশ্রয় নিয়েছি। এই মড়ার দেশে এসে ভেজাল আর পাথর কুচি খেতে খেতে জীবনটা শেষ হয়ে গেল।”

ওরা যখন কথা বলতে সুরু করে উত্তেজনায় ওরা ভুলে যায় যে ওরা অফিসে বসে কথা বলছে। ভুলে যায় ওদের চেঁচিয়ে কথা বলা শুনে কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে বলছে—“যত্তো সব বাঙ্গাল এসে জুটেছে। গলা তো নয় সব—নলা!”

দেশ ভাগ মানেই হা হুতাশ। যারা ভেসে বেড়াচ্ছে তারাও করছে আবার যারা চাকরী টাকরী জুটিয়ে নিয়ে দশটা পাঁচটা করছে তাদের মুখেও ঐ হা হুতাশ। যাদের বাঙ্গাল বলে কলকাতার লোকরা বিদ্রূপ করত, আজকাল পথে ঘাটে, অফিসে কাছারীতে তাদেরই দাপট বেশী। ছেলেবেলার সেই স্বপ্নের দিনগুলো যে ঐ দেশেই কেটেছিল সুপর্ণার। সর্ব্বস্ব দিয়ে এই স্বাধীনতাই কি আমরা চেয়েছিলুম! শংকর আজ যদি তুই আমার সামনে এসে দাঁড়াতিস্ তোকে বলতুম—‘জীবন দিয়ে আমরা স্বাধীনতার সম্মান পাইনি, পেয়েছি স্বাধীনতার গ্লানি, অপমানের যন্ত্রনা—।’

সন্ধ্যেবেলায় সুপর্ণা তার সেতারটা নিয়ে ভাস্করের ঘরের সোফাটার ওপর বসে পড়েছে। খাটের ওপর বালিশে ঠেস দিয়ে বসেছিল ভাস্কর, হাসিমুখে ওর দিকে চেয়ে বলল—“আজ আমি এইটুকুই চেয়েছিলুম গৌরী—।”

—“জানি”—হাসিমুখে উত্তর দেয় সুপর্ণা। টুং করে সেতারের তারে ঝংকার তোলে।

—“তোমার চিন্তা ভাবনা ইচ্ছে, অনিচ্ছে সবই যে আমার জানা। আজ নয় বহুদিন থেকে।” সুপর্ণা হাসছিল, হাসতে

হাসতেই আর একবার টুং টাং আওয়াজ তুলল।

—"আজ কেমন জ্যোৎস্না উঠেছে দেখেছ? জান আমরা দুজনে দুজনের জন্যে জন্মেছিলুম। এর পর যা করবার তুমিই কর, আমি নিজেকে ছেড়ে দিচ্ছি তোমার হাতে।"

ভাস্কর হাসিমুখে বলল—"আজ আমার খুব ভাল লাগছে গৌরী। মনে হচ্ছে এমনি করে যদি জীবনের শেষ কটা দিন কেটে যেত।"

গৌরী ঠোঁট খুলে একটু হাসি ছড়ালো ভাস্করের মুখের দিকে চেয়ে। ভাস্করের দুর্বল মুখে একটা খুসী খুসী ভাব ফুটে আছে। টলটলে দুটি চোখে চাপা হাসি।

—"জান গৌরী আজ বারবার মনটা যেন অতীতের দিনগুলির দিকে ফিরে যেতে চাইছে। মনে পড়ছে পদ্মার কথা, ইছামতীর কথা। মনে পড়ছে আমাদের নিলু পাগলার বাঁশের বাঁশীর সেই সুর। গ্রামের শেষে সেই কালীতলার ঝাঁকড়া বটগাছটার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে সে বাঁশী বাজাতো। বেলা শেষের গোধূলি আলো যখন ছড়িয়ে পড়ত চারিদিকে তখন দূর থেকে ওর বাঁশীর সুর ভেসে আসত। ওর বাঁশীতে কি সুর বাজত আমি জানিনে, কিন্তু আমার মনটা কেমন উদাস হয়ে যেত। মনে হোত আমি একলা একলা চলে যাই অনেক দূরে। বাঁশবনের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে পদ্মার দিকে যে রাস্তার পাশে আমগাছে বসে ঘুঘু ডাকছে ঘুঘুর ঘু-ঘুঘুর ঘু, যে রাস্তার দিয়ে গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে চলেছে পদ্মার জল আনতে, দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাঝিদের সারি গান, আমার মনে হোত সেই পথ ধরে অনেক দূরে চলে যাই। আমার মন উতলা হয়ে উঠত, চোখ অকারণে জলে ভরে উঠত। মমতা এসে আমার হাত ধরে আবদার করে বলত—'চল্ না দাদা, নিলু পাগলার বাঁশী শুনে আসি।' চমক ভাঙ্গত আমার, বলতুম—'না রে মিতু সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এখন গেলে বাবা বকবেন। মা ঘরের চৌকাঠে চৌকাঠে জলের ছিটে দিয়ে সন্ধ্যে প্রদীপ জ্বালাতেন, তুলসীমঞ্চে

প্রদীপ রেখে ধুনো দিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করতেন। আঁচলে বাধা চাবির গোছাটা মায়ের গলার পাশ দিয়ে ঝুলত। মাকে কেমন যেন দূরের মানুষ মনে হোত তখন। আমার মন কেমন করে উঠত।"

—"তুমি শিল্পী কিন্তু ভগবানের কি অবিচার দেখ। তোমার হাতের তুলি কেড়ে নিয়ে সেখানে তুলে দিল রিভলবার। তুমি যা হতে পারতে তা হলে না, সব কিছু উল্টে পালটে ভেস্তে গেল।"

সেতারের তারের ওপর দিয়ে কয়েকবার এলোমেলো ভাবে আঙ্গুল বোলাল সুপর্ণা। ঝনঝন করে উঠল সেতারটা। সোজা হয়ে বসল ভাস্কর—"এবারে একটু বাজাও গৌরী—"

—"তার চেয়ে তুমি একটা আবৃত্তি কর।"

—"বেশ, তারপরে কিন্তু তোমায় বাজাতে হবে।" ভাস্কর ধীরে ধীরে আবৃত্তি করে গেল—

'কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব, অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন দেশে সে কোন দেশে।
কূলহারা সমুদ্র মাঝখানে
শোনাব গান একলা তোমার কানে,
ঢেউএর মত ভাষা বাঁধনহারা
আমার সেই রাগিণী শুনবে নীরব হেসে।
আজো সময় হয়নি কি তার, কাজ কি আছে বাকী?
ওগো, ওই যে সন্ধ্যা নামে সাগর তীরে
মলিন আলোয় পাখা মেলে সিন্ধু পারের পাখী
আপন কুলার মাঝে সবাই এল ফিরে,
এখন তুমি আসবে ঘাটের পরে
বাঁধন টুকু কেটে দেবার তরে।

অস্ত রবির শেষ আলোটির মত
তরী নিশীথ মাঝে যাবে নিরুদ্দেশে।'

আবৃত্তি শেষ হলে মুখ তুলে ভাস্করের মুখের দিকে একবার চাইল সুপর্ণা। একটা অভিমান ফুটে উঠল ওর চোখের কোণে, তারপর সেতারে সুর তুলল আশাবরী রাগিনীতে 'বাঁধন যেথায় চেয়েছিলাম, সেথায় পেলাম ছাড়া'—.

সেতারের করুণ সুর অনেকক্ষণ ভরে রইল ঘর খানায়। রজনী-গন্ধার মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে ধূপের গন্ধ মিশে ঘরখানা পূজোর ঘরের মত মনে হচ্ছে। বড় আলোটা নিবিয়ে দিয়ে নরম আলোর সবুজ টিউবটা জ্বেলে দিয়েছে সুপর্ণা।

—"তুমি কি আমায় পাথরের দেবতা বানিয়ে ছাড়া পাবার ব্রত নিয়েছ গৌরী ?"

—"মানে ?"

—"আজকের এই আনন্দের দিনে তোমার সেতার যে সুর শোনাল সে তো মিলনের সুর নয়, সে যে বিচ্ছেদের।"

সুপর্ণার চোখ হুটো হঠাৎ জলে ভরে উঠল।

—"ওখানে নয়, আমার কাছে এসে বস গৌরী। দেখি মুখখানা।" হুহাতের অঞ্জলিতে মুখখানা তুলে ধরতেই ঝরঝর করে কয়েক ফোঁটা জল ভাস্করের হাতের ওপর ঝরে পড়ল।

"তুমি কাঁদছ গৌরী ?

"যাঃ কাঁদছি আবার কোথায় ? তুমি আমার এত কাছে, আজ আবার কান্না কিসের ?"

গৌরীর চোখের ওপর চোখ রেখে হাসল ভাস্কর!

"হুঁহু কোরে হুঁহু কাঁদে
বিচ্ছেদ ভাবিয়া"—তাই না ?

সুপর্ণার মুখের দিকে শান্ত দৃষ্টি তুলে চেয়ে রইল ভাস্কর। সে দৃষ্টির সম্মুখ থেকে সুপর্ণা তার দৃষ্টিকে নামিয়ে নিল না। ওর

জলভরা চোখ দুটি শিশির ভেজা পদ্মের মত ভাস্করের মুখের দিকে ফুটে রইল। অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। ভাস্কর একসময় সুপর্ণার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল—"তুমি আমার কাছে কি চাও আর আমি তোমায় কতটুকু দিতে পারি তা আমি ভেবে পাইনে গৌরী—।"

—"আমি তোমার কাছে যতটুকু পেয়েছি তাই আমার যথেষ্ট। আমায় তোমার যতটুকু ভাল লাগে তাই লাগুক। তাব বেশী আমিও চাইনে, তুমিও দিতে যেও না।"

"গৌরী, তুমি আশ্চর্য শান্তভাবে আশ্চর্য কঠিন কথা বলতে পার! তুমি যে আমায় এই হাতখানি দিয়েছ, তা যে কতখানি পাওয়া তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারিনে।"

"আমাদের এ আগুনে পোড়া প্রেম। এ নিজেও মুক্ত অন্যকেও বেঁধে রাখে না।"

ভাস্কর হাসল।

—"জান, আজ ভোর বেলায় একটা স্বপ্ন দেখলাম। মনে হল আকাশ থেকে ভেসে আসছে সাহানা রগিনীতে সানায়ের সুর। আলপনা আঁকা পিঁড়ির ওপর বসে আছে বর কনে। পুরুত মন্ত্র পড়াচ্ছে। কনে যেন বরের কানে কানে বললে—তুমি যে তুমিই এই আমার যথেষ্ট।

সুপর্ণা মুখ তুলে একটু হাসল।

"ভাবছি কাল থেকে একটা পেন্টিং আরম্ভ করব। ছবির নাম হবে 'দাসত্ব মোচন'। তোমায় কিন্তু গোটা চারেক সিটিং দিতে হবে গৌরী —"

"আমার অফিসে নেই? মডেল হয়ে বসে থাকলেই চলবে আমার"—

"সকালে একঘণ্টা, রাতে একঘণ্টা, প্লিজ—"

—"তুমি কিন্তু আগের মতই সেই ছেলেমানুষ আছ।"

সতেরো

ছবি আঁকতে আঁকতে ভাস্কর গৌরীকে ধমক দিয়ে ওঠে 'বলে দিলুম তো কি ভাবে পোজ্‌টা নেবে। মনে কর সুদীর্ঘ দিন মোটা মোটা লোহার শেকল দিয়ে তোমায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল। শরীরের কোন জায়গায় তোমার কড়া পড়ে গেছে, কোন জায়গার চামড়া পিষে গেছে। কোনও জায়গায় দগ্‌দগে ঘা। শৃঙ্খল মোচনের পরও তুমি উঠে দাঁড়াতে পারছ না ; ব্যথায়, বেদনায় অত্যাচারে তোমার শরীর কঙ্কালসার, অবসন্ন, অসুস্থ। তবু তুমি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছ, তোমার মুখে একটা ক্লান্ত অথচ শান্ত হাসি ফুটে উঠেছে।"

"আমায় কি তুমি সিনেমা এ্যাকট্রেস্ পেয়েছ যে পজিসন বুঝিয়ে যা পোজ নিতে বলবে তাই আমি নেব। আমার দ্বারা এ সব হবে না।"

"গৌরী লক্ষ্মীটি আপত্তি করো না! আমি জানি তুমিই পারবে এ পোজ নিতে ; তুমি যে ভুক্তভোগী। মনে কর শংকরেব কথা। মনে কর তোমার বাবা মার কথা। মনে কর মমতা সুপ্রিয়র কথা—প্রতিটি বেদনা নিজের মনে পুঞ্জীভূত করে নাও। মনে কর রক্তাক্ত শংকর তোমার দিকে মুখ তুলে বলছে বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক। তোমার বাবা শংকরকে বুকে জড়িয়ে ধরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন মাটিতে তাঁর সারা শরীর দিয়ে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে! মনে কর চন্দ্রদার বুকে মাথা রেখে লালদি থরথর করে কাঁপছেন। চন্দ্রদার রিভলবারের ছুটো গুলি তার মাথা ভেদ করে চন্দ্রদার বুকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেল। মনে কর মমতার ক্ষত বিক্ষত দেহটা কোলে নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে সুপ্রিয়। মনে কর—"

—"না-না-না"—একটা অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ থুবড়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে গৌরী। তার খোলা চুল ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে।

ভাস্কর সস্নেহে ডাকে—"গৌরী"

আস্তে আস্তে মাথা তোলে গৌরী—। ওর ছুচোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। মুখে একটা অসহ্য যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠেছে। ঠোঁটের

কোণে একটা ক্লান্ত অবসন্ন হাসি।

—"জাষ্ট এ মিনিট গৌরী"—

সারাদিন ছবির মধ্যেই ডুবে থাকে ভাস্কর। সুপর্ণা অফিস থেকে ফিরলেই বলে—"ছাখ তো গৌরী, কেমন হচ্ছে ?"

—"তুমি কিন্তু ছবির জন্যে বড্ড বেশী খাটছ। ক দিনেই তোমার শরীরটা বড্ড বেশী কাহিল হয়ে গেছে। আর একটু সুস্থ হয়ে নিয়ে তারপর ছবিটা শেষ কর।"

—"না গৌরী, ছবিটা শেষ করেই আমি বিশ্রাম নেব"—

—"কিন্তু ডাঃ গুপ্ত তোমায় বেশী পরিশ্রম করতে বারণ করেছেন" দিন দিন তুমি কেমন পেল হয়ে যাচ্ছ। আমার বড্ড ভয় করছে।"

—"মিথ্যে ভয় করো না গৌরী এত শিগগিরি আমি মরছি নে' তোমায় হারাবার দুঃখ আমারও কম নয়।"

সেদিন সন্ধ্যায় ডাঃ গুপ্ত গৌরীকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন-"এ রকম কেস্ হাতে রাখতে আমি আর ভরসা পাচ্ছি নে মিস্ মুখার্জি"—

—"কেন কি হয়েছে ওর ? আপনি তো বলেন এ্যানিমিয়া"—

—"ক্রনিক এ্যানিমিয়াও তো ভাল নয়। এতদিন ধরে চিকিৎসা হচ্ছে কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারছি নে। কেসটা যেন ক্রমশঃ কমপ্লিকেটেড্ হয়ে উঠছে। আপনি বরং কোনও স্পেশালিষ্টকে দিয়ে চিকিৎসা করান।"

—"আপনার কি মনে হয় ওর কোন খারাপ রোগ হয়েছে"—

—"ঠিক করে বলা যায় না তবে মনে হয় 'লিউকোমিয়া'—

—"রোগটা বুঝি খুবই ভয়ের ? একি সারবার রোগ নয় ?"

—"রোগটা খারাপ। এ ডিজিজ অব ব্লাড, ব্রেকিং অব রেড ব্লাড সেলস্"—

ডাক্তার গুপ্ত চলে যাবার পরও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুপর্ণা। ওর পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেছে। নিজের হাত পা মুখ সবই যেন অসাড় হয়ে গেছে। নিজেকেও যেন অনুভব করতে পারছে না ও।

ভাস্কর কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। ওর হাত খানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলে—"চল ঘরে গিয়ে বসি। ভয় কি? ডাক্তাররা অমন অনেক কথা বলে থাকেন। সবই কি আর সত্যি হয়? তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

হঠাৎ একটা আর্ত্তনাদ করে ভাস্করের বুকে নিজের মুখটা লুকোয় সুপর্ণা। তারপর দুহাতে ভাস্কর কে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে। ভাস্কর আস্তে আস্তে নিজের হাতটা সুপর্ণার মাথায় বুলাতে থাকে। যতটুকু সান্ত্বনা পায় সুপর্ণা ততটুকুই ভাল। এ কান্নারও ওর প্রয়োজন ছিল। হয়তো কাঁদলেই ও একটু শান্তি পাবে। চুপ করে বসেই রইল ভাস্কর একটাও সান্ত্বনার কথা বলল না। সুপর্ণা তখনো ভাস্করের বুকেব আশ্রয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর ভাস্কর নীরবে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

নাঃ আর পারছে না সুপর্ণা। দরজা খুলে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। গলানো রূপোর মত জোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের প্রতিটি জিনিষের ওপর। জোৎস্নার আলো ছায়ায় একটা অশরীরী আত্মার মত বাড়ীটার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল সুপর্ণা। একদিন এ বাড়ী পরিপূর্ণ ছিল। এই ঘরে থাকতেন বাবা, এই ঘরে মা, এই ঘর ছিল শংকর আর গৌরীর। আজ প্রতিটি ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। একখানা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় সুপর্ণা। এই ঘরখানা সব সময় তালা বন্ধ থাকে, তালাতে মরচে ধরেছে। এ ঘরের চাবি খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ঘর বিধবা, এ ঘরে যে থাকতো আজ সে আর নেই। মরচে পড়া তালাটার ওপর হাত রাখল সুপর্ণা। চোরের মত বন্ধ দরজায় কান পাতল।—একটা হু হু শব্দ যেন ভেসে আসছে ঘর থেকে। কতদিন এ ঘরে আলো জ্বলেনি। দিনের বেলাতেও এ ঘরে কেউ আসে না। একটা চিহ্নের মধ্যে যেন মৃত্যুকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

মরচে পড়া তালাটা ধরে টানল সুপর্ণা। সজোরে ঝাঁকুনী দিল কয়েকবার। ঝনঝন আওয়াজ উঠল। নিস্তব্ধ রাত্রির অখণ্ডতা যেন ভেঙ্গে

খান খান হয়ে গেল। চমকে উঠল ও। ওর গা ছমছম করে উঠল।

আশ্চর্য তালাটা খুলে গেছে। দুহাত দিয়ে ঠেলে দরজাটা খুলে ফেলল সুপর্ণা। খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে একঝলক জ্যোৎস্না ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। আলোর সুইচটার ওপর ঝুল জমেছে। সুইচটা টিপতেই আলোয় ভরে গেল ঘরখানা। সব তেমনিই আছে কেবল সব কিছুর ওপর মাকড়সার জাল আর ধূলোর প্রলেপ। ইজেলের সঙ্গে আঁটা আছে ভাস্করের শেষ ছবি 'দাসত্ব মোচন'। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে ছবিখানার সামনে দাঁড়াল সুপর্ণা। ছবিখানার ওপরও মাকড়সা জাল বুনেছে। পরম মমতায় আঁচল দিয়ে মাকড়সার জালগুলো ছবিখানার ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলল সুপর্ণা খাটেব পাশে টিপয়টার ওপর রবি ঠাকুরের একটা কবিতাব বই খোলা পড়ে আছে। স্বপ্নাবিষ্টের মত বইখানা হাতে তুলে নিল সুপর্ণা খোলা পাতার ওপর চোখ দুটো স্থির হয়ে রইল—

—"এতকাল আমি রেখেছিনু যতন ভরে
শয়ন পবে
ব্যথা পাছে লাগে, দুঃখ পাছে জাগে
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসর শয়ন করেছি রচন কুসুম থরে
দুয়াব রুধিয়া রেখেছিনু তাবে গোপন ঘরে
যতন ভরে।"

জীবন যেমন আসে জীবন তেমনি চলে যায়। মৃত্যুও যেমন আসে, মৃত্যুও তেমনি চলে যায়। তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা অর্থহীন। জীবন প্রবাহ অবিশ্রাম মৃত্যুকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। জীবন মৃত্যুর প্রবাহকে রুদ্ধ করা চলে না। জীবনের চারটি দেওয়ালের মধ্যে কোন একটি দিনকে চিরদিন রুদ্ধ করেও রাখা যায় না। যখন পূর্ণিমার চাঁদের আলো রুদ্ধ দরজার সামনে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকে তখন তার সব বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। বদ্ধ ঘরের সব জানালা একে একে খুলে দেয় সুপর্ণা।

সুপর্ণার আজ কেউ নেই, কিছু নেই। তার যত কথা আছে সমস্ত সে এই চিহ্ন শূন্য, বাধা শূন্য পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে দিতে

পারে। সে বলতে পারে হে বিশ্বদেবতা তোমার আনন্দ লীলামঞ্চে তুমি সারি সারি যে আলো জ্বালিয়ে রেখেছ, আমার মুখ সেই দিকে ফিরিও দাও। চারিদিকে মৃত্যুর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে, তবুও মানুষ বলছে আমরা অমৃতের পুত্র। মৃত্যুর অন্ধকার সত্য নয়। মৃত্যুর পাশেই যে অমৃত আছে সে সন্ধান আমি পাচ্ছি কই।

ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় সুপর্ণা। পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে খোলা ছাদের ওপর এসে দাঁড়ায়। রাতের অন্ধকার কেটে গেছে। পূবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। এখনই সূর্য্য উঠবে। দুহাত জোড় করে কার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সুপর্ণা মনে মনে বলে—একদিন আমায় এই চলার পথকে মনে হয়েছিল এ আমারই পথ, এখন মনেহয় কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলে যাবার অধিকারই আছে আমার। এপথ চলারপথ, ফেরবারপথ নয়। আজ রাত্রি শেষে একটিবার আমার ফেলে আসা পথটির দিকে পেছন ফিরে চেয়ে দেখলুম, এই পথটি বিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী। সেই চেনা চাহনী, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটিবারও আমি ফিরে যেতে পারব না। চলার পথে একদিন যাদের চরণ চিহ্ন ফুলের মত ঝরে পড়েছিল আজ তারা কোথাও নেই।

এখন ভারত সাগর তীর্থে সূর্য্যোদয় হচ্ছে। আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি ভারতের উত্তর পুরুষ পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে পূর্ব দিগন্তের দিকে মুখ করে। ওদের কপালে লেগেছে প্রভাতের আলো। ওদের জন্যে পথের ধারের জানালাগুলো খুলে গেছে। পথ ওদের সামনে খুলে ধরেছে নিমন্ত্রণের রাঙাচিঠি। বলছে তোমাদের জন্যে সব প্রস্তুত।

ভোরের স্পর্শ নামল মাটিতে। বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য। প্রভাতের প্রথম আলো ওদের কপালে পরাল সোনার চন্দন। তরুণের দল ডাক দিল—চল যাত্রা করি। আমরা দিব্যধাম বাসী অমৃতের পুত্র। জগতের মৃত্যুর বাঁশীর মধ্যে দিয়েই আমরা অমৃতের বানী প্রচার করব—আমরা মৃত্যুকে জয় করব।